Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলা

Subject Code | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫

খ. উপস্থিতি ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ব্যাকরণ : ৭টি প্রশ্ন হতে প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সাহিত্য :

ক. গদ্য : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

খ. পদ্য : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

সর্বমোট = ১০০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** মানবণ্টনে ব্যাকরণ অংশ শুরুতে থাকলেও বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নে শেষে থাকে। সে অনুযায়ী সাজেশনের প্রশ্নধারা সাজানো হয়েছে।]

Exclusive Suggestions

ক বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-১ ও ২ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সম্ভাবনার হার		
৯৯%	ক.	চর্যাপদে বাঙালি জীবনধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।
৯৯%	খ.	মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান কাব্যধারার মূল্যায়ন কর।
৯৯%	গ.	বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলিম সাহিত্যিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।
৯৯%	ঘ.	বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা আলোচনা কর।
৯৯%	ঙ.	বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা কর।
৯৯%	চ.	বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলতে কী বুঝ? প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্য নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৯৯%	ছ.	টীকা : (১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, (২) ইউসুফ-জুলেখা।

খ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৩ ও ৪ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯%	ক.	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল' প্রবন্ধে সমাজ-বাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।
৯৯%	খ.	'তৈল' প্রবন্ধ অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত আলোচনা কর।
৯৯%	গ.	সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে যে নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	ঘ.	ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে কাজী নজরুলের 'শিউলিমালা' গল্পের সার্থকতা বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	ঙ.	'শিউলিমালা' গল্পের আলোকে শিউলির চরিত্র অঙ্কন কর।
৯৯%	চ.	রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যে নিগূঢ় সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়, তা আলোচনা কর।
৯৯%	ছ.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পের আলোকে মৃন্ময়ী চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	জ.	'সমাপ্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ নিরীক্ষার অনবদ্য দলিল– ব্যাখ্যা কর।

সম্ভাবনার হার

গ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৫ ও ৬ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯% ক. 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মহত্ত্বের পরিচয় দাও।

৯৯% খ. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় লেখ।

৯৯% গ. 'স্বাধীনতা তুমি' শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা বন্দনার অনন্য প্রয়াস– বিশ্লেষণ কর।

৯৯% ঘ. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতা অবলম্বনে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

৯৯% ঙ. "'বনলতা সেন' একটি অনন্য আধুনিক বাংলা কবিতা"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার বিশ্লেষণ কর।

৯৯% চ. 'বলাকা' কাব্যের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

৯৯% ছ. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'মুসাফির' কবিতার মূলভাব লেখ।

ঘ বিভাগ

মান– ৫ × ৪ = ২০

প্রশ্নক্রম-৭ ও ৮ : যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯% ক. "ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষা অনুসরণ করে"– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৯৯% খ. উপভাষা কাকে বলে? কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯৯% গ. নিচের সাধু রীতির শব্দগুলোর প্রমিত রীতিতে পরিবর্তন করে বাক্য গঠন কর।
মালঞ্চ, কাঞ্চন, শস্য, হরিৎ, রক্ত।

৯৯% ঘ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো পাঁচটি) :
আকাংখা, উৎকৃস্ট, উপরোক্ত, কাহিনী, প্রতিদ্বন্ধি, শশুর, সৌজন্যতা।

৯৯% ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো পাঁচটি) :
জীবনবীমা, ছাত্রাবাস, সপরিবার, সেতার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, নয়ছয়, হাসাহাসি, বহুব্রীহি, আমরা, দ্বিগু, নয়-ছয়, উপকূল, তেমাথা, আনাগোনা, শতাব্দী।

৯৯% চ. ভাব-সম্প্রসারণ কর :
(১) মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন,
বিলাস ধন নহে।
(২) "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"।

৯৯% ছ. তোমার এলাকায় একটি মডেল মসজিদ স্থাপনের আবেদন জানিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

৯৯% জ. তোমার মাদরাসায় 'আরবি ভাষা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

৯৯% ঝ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৯৯% ঞ. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

৯৯% ট. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের তিনটি করে নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৯৯% ঠ. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লেখ।

৯৯% ড. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রভাষক পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলা

Solution to Exclusive Suggestions

ক বিভাগ

মান – ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-১ ও ২ : যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ চর্যাপদে বাঙালি জীবনধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : চর্যাগীতিকাগুলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতিমূলক গান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধ্যাভাষায় রূপকের মাধ্যমে সাধকদের গূঢ় ধর্মসাধনার কথা প্রচার করা। চর্যাপদগুলোর রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত না হলেও নানা আলোচনা হতে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাতে জানা যায় যে, এগুলো দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক মতে, এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল ছিল। তখন চর্যাপদকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থায় নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার যেসব রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

চর্যাগীতির ভাব, ভাষা

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যায় ভাবের বিষয় থাকে। এ ভাব কখনো গুরুগম্ভীর হয়। ভাব-সংগীতে মনের কথা বিধৃত হয়। আবার এর আবিষ্কারের পর পন্ডিতদের মধ্যে এর ভাষা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে তাঁরই সম্পাদনায় "হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের অন্তর্গত সকল অংশেরই ভাষা বাংলা নয়, একমাত্র চর্যাপদের ভাষা বাংলা বলে অভিমত দেন।

চর্যাপদের ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার স্বকীয়তা পুরোপুরি পরিগ্রহ করতে পারেনি। এই অপরিণত ভাষাতেই চর্যাপদের কবিগণ ধর্মতত্ত্ব প্রতিফলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব চর্যাপদের মহাসুখতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এ মহাসুখের স্বরূপ ও তা লাভের পন্থা চর্যাপদে কখনো প্রহেলিকা ভাষায়, কখনো দার্শনিক ভাষায়, কখনো যোগসাধনের পরিভাষায়, কখনো বা তান্ত্রিক কায়াসাধনের গূঢ় সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। আর এ বক্তব্য প্রকাশের জন্য তখনকার সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষার সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বলে তখনকার ভাষার প্রাচীনত্বের দরুন গৌড় অপভ্রংশের প্রভাব এতে রয়েছে। ফলে কেউ কেউ অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া বা আসামি ভাষা বলে দাবি করেন। একই গোষ্ঠীজাত বলে এসব নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার মিল রয়েছে। চর্যাকারেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সকলের ভাষা একরূপ হতে পারে না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আর্যদের ভাষা উড়িয়া, শান্তিপাদের ভাষা মৈথিলী এবং কাহ্ন, সরহ, ভুসুকু প্রমুখের ভাষা প্রাচীন বাংলা বঙ্গকামরূপী বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তবে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যার ভাষাকে খিচুরি ভাষার সমষ্টি বলে মত প্রকাশ করেন। অবশ্য বিজয়চন্দ্র ভাষার ব্যাকরণ না ধরে বিচ্ছিন্ন শব্দ ধরে তা প্রমাণে অগ্রসর হয়েছেন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের অন্তর্গত উপভাষাগুলোর রূপ মোটামুটি একই ছিল। একে অপভ্রংশ স্তর বলা হয়। বাংলা, আসামি, উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে শুধু শব্দ নিয়ে প্রথম স্তরের যে-কোনো ভাষাকে অন্য ভাষা বলে দেখানো সহজ। শুধু দু'চারটে শব্দ ধরেই উড়িয়া বলা যাবে না। কারণ এদের মূল যেহেতু সংস্কৃত, সেহেতু এসব শব্দের বাংলায় প্রবেশ করাও সম্ভব। ফলে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যাভাষা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষা সম্পর্কে বলেন, "আলো-আঁধারি ভাষা– কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাহারা সাধন-ভজন করেন, তাহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।" এ কারণে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা।

চর্যাপদে বিধৃত সমাজচিত্র/বাঙালি জীবনধারা

প্রথমত, চর্যাপদে যে সমাজের চিত্র পাওয়া যায় তা একান্তভাবে বাংলা-বাঙালির নয়; সমগ্র পূর্ব ভারতের। চর্যাপদে যাদের চিত্র পাওয়া যায় তারা ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত, বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, নদী, নৌকা, সাঁকো, ঘাট, পাটনী, মূষিক, তুলো, সোনা-রুপা, মদ, অবৈধ প্রেমকাহিনি, প্রতিবেশ,

তৈজসপত্র, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। সমাজের নিচু স্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে প্রতিফলিত হয়েছে। শবর মেয়েরা খোঁপায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা পরতো। সে সমাজ তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল– ডাকিনী, যোগিনী, কুহকিনী– এমনকি কামরূপ কাম্যাখ্যার নামও উপস্থাপিত হয়েছে চর্যাপদে। তারা সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে বাস করতো গ্রামের প্রান্তে, পর্বতগাত্রে কিংবা টিলায়। ২৮নং চর্যায় বলা হয়েছে এভাবে–

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥

দ্বিতীয়ত, চর্যায় যে মানুষগুলো উঠে এসেছে তারা মূলত নিম্নবিত্তের; যেমন– ডোম-ডোমানী, শবর-শবরী, কাপালিক, জেলে, পাটনি, কৃষক, তাঁতিসহ খেটে খাওয়া বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। কৃষি ও নৌ-বাণিজ্যের আভাস পাওয়া গেলেও মূল অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। কাহ্নপা ডোম জাতির দারিদ্র্য জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। ডোমরা কুঁড়েঘরে অত্যন্ত হীনাবস্থায় দিন কাটাত। কাপালি, যোগী, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি বর্ণের মানুষ এদের প্রতিবেশী ছিল। তন্ত্র-মন্ত্র যোগ ও সহজ সাধনা সমাজে প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করতো। সমাজে নৃত্য গীতের প্রচলন ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। অসামাজিক প্রেমের পরিণতিস্বরূপ সমাজে ধর্মত্যাগ ও কুলত্যাগ ঘটত। যোগীরা গলায় হার, মালা পরিধান করতো। উদ্দাম, মুক্ত ও প্রেমময় সচ্ছল জীবন তাদের কাম্য ছিল।

তৃতীয়ত, সমাজে শিকারের প্রচলন ছিল। হরিণ তার মাংসের জন্য সবার কাছে শত্রু হয়ে ওঠে– তার মাংসের জন্য সকলে তাকে হত্যা করতে চায়। শিকারি সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করে, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। হরিণ তাই তৃণ-জল পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। আসলে এটা রূপকও বটে– তৎকালীন সমাজে উচ্চবিত্তদের অত্যাচারে সাধারণ জনগণ যে অন্য কোথাও [টিলা, পর্বত, নগরে বাইরের গ্রাম] শান্তির জন্য আবাস গড়ে তুলেছিল তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়। যেমন–

হরিণী বোলই হরিণা সুণ তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভাস্তো ॥

চতুর্থত, চর্যাপদে বর্ণিত আছে, দরিদ্র নারী মদ বিক্রি করে। মদ্যপায়ীরা মদ ক্রয়ের জন্য সব সময় তাদের ঘরে আসে। নিম্ন শ্রেণির মেয়েরা মদ চোলাই করে এবং কাপালিরা সেই মদ্য পান করে। সামারা বা সোমরস থেকে মাদকদ্রব্য তৈরি হতো। ব্যবসায় চলত কড়ির মাধ্যমে। কড়িই ছিল প্রচলিত মুদ্রা। দরিদ্র বলেই তারা ক্রেতার প্রতীক্ষায় সারাদিন দোকান খুলে বসে থাকে। দরিদ্র গৃহের শূন্যতা, নিরাহার এবং অসুবিধার কথা উল্লেখ আছে চর্যাপদে। যে গৃহস্থের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে আমন ধানের সঞ্চয়, সেই আমন ধান ইঁদুরে খেয়ে নেয়, তাদের দুঃখের অন্ত থাকে না। যাদের ঐশ্বর্য নেই, গৃহ নির্মাণ করার সামর্থ্যও নেই, তারা অস্থায়ী বসবাস করে এবং আশ্রয়ের সন্ধানে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে।

পঞ্চমত, চর্যাগীতিগুলোর মধ্যে যে সমাজচিত্র ও বাস্তব জীবনযাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে একদিকে সমাজের ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে; অন্যদিকে দুঃখপূর্ণ দরিদ্র জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন উপাদান লক্ষ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও অশান্তির চিত্র চর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন–

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিলু দুধু কি বেণ্টে সামায় ॥

ষষ্ঠত, সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র চর্যাপদে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নাগরালী, কামচণ্ডালী, ছিনালী, পতিতা, লম্পট প্রভৃতি রূপক চর্যায় ব্যবহৃত হয়ে সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। দিনে বধূ কাকের ভয়ে ভীত– কিন্তু রাতে সে গোপন অভিসারে একাই বের হয়। ২নং চর্যায় বলা হয়েছে–

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরূ জাই ॥

সপ্তমত, চর্যায় তৎকালীন বাঙালির আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির আভাস সহজেই পাওয়া যায়। একাধিক চর্যায় উল্লেখ থাকায় মনে হয় শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-শালি নিয়ে বাঙালির যৌথপরিবার গড়ে উঠতো। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া, নতুন ফসল উঠলে নারী-পুরুষের আমোদ করা, মেয়েদের অলংকার হিসেবে কঙ্কণ-নূপুর-ফুলের ব্যবহার, যৌতুকের লেনদেনের বিষয়ে নিখুঁত চিত্রও চর্যাপদে পাওয়া যায়। যেমন–

ভব নিব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি কর– কশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ ॥
ডোম্বী বিবাহিঅ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুত্তর ধাম ॥

অষ্টমত, চর্যায় বর্ণিত, তখন সমাজে জলদস্যুদের উৎপাত ছিল সাধারণ ঘটনা। বহিরাগত জলদস্যুরা শুধু নৌকায় ডাকাতি করতো না, দেশের অভ্যন্তরেও লুটতরাজ চালাত। বিদেশি দস্যু ও বণিক উভয়ই আসত এদেশে। ফলে স্থানে স্থানে থাকা কাছারি ও দারোগা পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। সমাজে চোরও ছিল–

কানেট চোরে নিল কাগই মাগই।

সেই সমাজে তুলো দিয়ে সুতো, কাপড়, কম্বল প্রভৃতি তৈরি হতো। ধনুরীরা তুলোর সাহায্যে নানা জিনিস তৈরি করে দিত। স্বগৃহে তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় বোনা হতো। সমাজে তাঁতিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

উপসংহার : চর্যাপদে যে সমাজচিত্রের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে তা এক সময়ের মানুষের সামাজিক অবস্থানকেই প্রকাশ করে। চর্যাপদে যে জীবনধারার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাতে উচ্চ জীবনধারার পরিচয় নেই। অধিকাংশ পদে অন্ত্যজশ্রেণির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেদনাবিধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের ব্যর্থতার আশাভঙ্গের বেদনা চর্যার গানে গানে উৎকীর্ণ। বাস্তব জীবনের এই দারিদ্র্য, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, ব্যভিচার ও বিপর্যয় গানে গানে ছড়িয়েছে রূপকের নানা অনুষঙ্গে। এভাবেই চর্যাগীতিকা হয়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজ সমাজের শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস এবং ধর্ম সংগীতের কাঠামোয় আশ্চর্য প্রাণবন্ত সামাজিক কবিতা, যা নির্দ্বিধায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

■ প্রশ্ন : খ ॥ মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান কাব্যধারার মূল্যায়ন কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ধারা অন্যতম। এই ধারায় মুসলমান কবি দ্বারা যে প্রেম সৌন্দর্য ও মানবলীলা প্রকাশিত হয়েছে তাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। হিন্দু কবিগণের আখ্যানমূলক কাব্যে লৌকিক জীবনের ছায়াপাত থাকলেও তাতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজারীতি প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে বেশিরভাগ মানবচরিত্র দেব-দেবী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ যদিও অনুবাদ–শ্রেণির সাহিত্য রচনা করেছেন, তথাপি এসব অনুবাদে মৌলিকতা এবং দেশীয় বিশ্বাস-সংস্কার–লোকাচার নানাভাবে মিশ্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অমর সৃষ্টি বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো যে অর্থে অনন্য/যেভাবে সমৃদ্ধ হয় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান প্রণয়কাব্যগুলো ফারসি অথবা হিন্দি থেকে অনূদিত। মধ্যযুগে রচিত কাহিনি কাব্যগুলো হলো– ইউসুফ-জোলেখা, হানিফা ও কয়রাপরী, সয়ফুলমুলুক, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, মধুমালতী, বিদ্যাসুন্দর, সতীময়না, পদ্মাবতী ইত্যাদি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর অনন্যতা বা সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিচে আলোচনা করা হলো :

শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' : শাহ মুহম্মদ সগীর শক্তিশালী কবি ছিলেন; ফারসি উৎসজাত 'ইউসুফ-জোলেখা'র মধুর প্রেম-কাহিনি তিনি সরস ভাষায় রূপায়িত করেন। রোমান্টিক কাহিনি কাব্যের মধ্যে 'ইউসুফ-জোলেখা'ই প্রাচীনতম। কবির কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ-জোলেখার প্রেমঘটিত কাহিনি বর্ণনা করে পাঠকদের মনে রসের যোগান দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনুভূতির প্রচ্ছনে নিছক ঐহিক জীবননির্ভর মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন কাব্য এটি। তাঁর আত্মবিবরণীর একটি ছত্রে সম্ভাব্য পাঠ "মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।" আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি ছত্র একই সঙ্গে বিবেচনা করে ড. এনামুল হক এই 'মহা নরপতি গ্যেছ'-কেই গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ বলে অনুমান করেন। কবির কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে নেই। এটুকু পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি সুলতানের রাজকর্মচারী ছিলেন। মূল কাহিনিটি ফারসি কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' থেকে নেওয়া হয়েছে। ড. ওয়াকিল আহমদ উল্লেখ করেন– "মুহম্মদ সগীর কুরআনকে ভিত্তি করে ইসলামি শাস্ত্র, ইরানের আধ্যাত্মিক কাব্য ও ভারতের লোককাহিনির মিশ্রণে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনি নির্মাণ করেন।"

দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী-মজনু' : মধ্যযুগের রোমান্টিক কাহিনি কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মূলত তাঁর 'লায়লী-মজনু' কাব্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। বাহরাম খান ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যমনস্ক। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ সুরের কাছ থেকে দৌলত উজির উপাধি লাভ করেন। এ কাব্যে লায়লী ও মজনু'র প্রেমকাহিনির বিয়োগান্তক পরিণতি কবিচিত্তের আবেগমিশ্রিত ভাষায় রচিত হওয়ায় অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। দৌলত উজির বাহরাম খাঁ রচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্যটি প্রেমের জগতে কিংবদন্তির মতো। দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী-মজনু'র রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ড. আহমদ শরীফের মতে 'লায়লী-মজনু' কাব্য ১৫৪৩ থেকে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা বাহরাম খান চট্টগ্রামের অধিপতি নিজাম শাহের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। পারস্য কবি জামির 'লায়লী-মজনু' কাব্যের ভাবানুবাদক। তবে কাহিনিতে উপস্থাপনায় এবং স্বাধীনভাব কল্পনায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, রূপক ও উপমার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। কাব্যটি আদি রসাত্মক। কাব্যে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবিক প্রবৃত্তির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'লায়লী-মজনু' কাব্যের কাহিনি এরূপ– আমির পুত্র কয়েস সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। লায়লীও সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। শুরু হয় লায়লী মজনুর প্রেম প্রণয়ের অভিষেক। পাঠশালায় বিদ্যা অর্জন করতে এসে তারা একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। বিদ্যা অর্জন নয় বরং প্রেম পাঠ যেন তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র। তাই পাঠশালা

ছুটির পরে তারা সকলের অজান্তে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে উঠে। তারা প্রেম প্রণয়ে এমনভাবে বিমোহিত হয় যে, প্রেমের আগুনে পুড়ে ছাই হবে তবুও তারা প্রেমাস্পদকে ভুলবে না। কিন্তু তাদের এ প্রতিজ্ঞা সুখের হলো না। লায়লী মজনু একে-অপরের জন্য বিরহে কাতর। জীবন বিপন্ন হতে দেখে লায়লী মাকে অনুরোধ করে তার মৃত্যু হলে মা যেন নিজেই মজনুকে খবর দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে লায়লীর মৃত্যু হলে মেয়ের শেষ ইচ্ছানুসারে মা নিজেই নজদ বনে গিয়ে মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দেয়। এ সময় লায়লীর মা মজনুকে বলে তার মেয়ে মজনু প্রেমে বিরহী হয়ে না খেয়ে জীবন বিপন্ন করেছে।

সাবিরিদ খানের রচনাবলি : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় সাবিরিদ খানের নাম স্মরণীয়। ড. এনামুল হকের মতে, কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে মনে করেন সাবিরিদ খান ষোড়শ শতকের কবি। মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যধারায় 'বিদ্যাসুন্দর', 'হানিফা ও কয়রাপরী' এবং 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন। সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কাহিনি সুপ্রাচীন। এই কাব্য রচনায় কবি সাবিরিদ খান প্রচলিত কাহিনি অবলম্বন করেছেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনি কালিকামঙ্গালের অন্তর্গত এবং ভারতচন্দ্রসহ অনেক কবি একই কাহিনিভিত্তিক কাব্যের রূপ দিয়েছেন। সাবিরিদ খানের কাব্যের কাহিনির সঙ্গে কালিকার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কাব্যরস সৃষ্টি ব্যতীত এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না; তবে মানবীয় রস এতে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি রোমান্স হিসেবেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। সাবিরিদ খানের অন্যতম রচনা হানিফা-কয়রাপরী জঙ্গনামা যুদ্ধকাব্য হলেও প্রেমকাহিনির জন্য তা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত। কবির কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে বলে কাব্যের নাম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ কাব্যের নামকরণ করেছেন 'হানিফার দিগ্বিজয়', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী' এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'হানিফা ও কয়রাপরী' নাম ব্যবহার করেছেন। কবির খণ্ডিত কাব্য থেকে কাহিনির উৎস সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। হযরত আলীর পুত্র মুহম্মদ হানিফা কাহিনির নায়ক। জয়গুনের সঙ্গে হানিফার পরিণয় হয় এবং দিগ্বিজয়ী হিসেবে উভয়েই বহু রাজাকে পরাজিত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। সাবিরিদ খানের 'রসুলবিজয়' কাব্য খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। কাব্যে হযরত মুহম্মদ (স)-এর রাজ্যজয় প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। কবি এ কাব্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

নওয়াজিস খান রচিত 'গুলে বকাওলী' : বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গদ্যে ও পদ্যে 'গুলে বকাওলী'র প্রেমকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ব্যতীত হিন্দি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায়ও এ কাব্য রচিত হয়েছিল। এ কাব্যের কাহিনি অলৌকিকতায় পূর্ণ বলে সেখানে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তবে নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবির সাফল্য স্বীকৃত। যেমন–

সে কন্যার রূপের সাগর পরিমাণ।
অল্পমতি এক মুখে কি করি বাখান।
শির স্বর্গ, মর্ত্য নাভি, পদ সে পাতাল।
ত্রিভুবনে কন্যারূপে মোহে সর্বকাল ॥

দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারায় দৌলত কাজীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখরিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশের বাইরে আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের সভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে মানবীয় আখ্যায়িকা প্রবর্তন করেন। রোসাঙ্গের রাজা শ্রী সুধর্মী সমর সচিব আশরাফ খানের অনুগ্রহে তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' নামক তিন খণ্ড বিশিষ্ট একখানি কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের কাহিনি প্রাচীনকাল থেকে লোকগাথা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। কাব্যের কাহিনি এমন– লোর রাজা তার সুন্দরী স্ত্রী ময়নামতীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে এক যোগীর নিকট গোহারী রাজকন্যা অর্থাৎ, বামনবীরের পত্নী চন্দ্রানীর রূপের কথা শুনে গোহারী গমন করে চন্দ্রানীর সাথে মিলিত হলেন। এরপর চন্দ্রানীর স্বামী বামনকে যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করে চন্দ্রানীকে বিবাহ করেন। এরপর দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নামতীর বিরহ বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডে ময়নামতী এক ব্রাহ্মণের হাতে রাজার নিকট একটি শুক পাখি পাঠালে লোর রাজার মনে পূর্বস্মৃতি জেগে উঠায় চন্দ্রানীসহ আপন রাজ্যে ময়নামতীর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নিয়তীর নির্মম পরিহাস তিনি দুই খণ্ড রচনা করে ইহলোক ত্যাগ করেন। ড. সুকুমার সেন বলেন, "দৌলত কাজীর কবিত্ব বিশেষ উপভোগ্য। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবি করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা কি ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন।"

আলাওল : আলাওল সতেরো শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহাবাদ পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর জেলা) জালালপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময়ে তাঁর পিতা ও তিনি পর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়েন। এই আক্রমণে তাঁর পিতা নিহত হন। তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে প্রথমে আরাকান রাজ্যের সেনাদলে কাজ পান তিনি; ক্রমে রাজদরবারের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন এবং রাজসভাসদভুক্ত হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কাব্যপ্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির গুণে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। এছাড়া 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' কাব্যও রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. পদ্মাবতী : রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যখানি হিন্দি ভাষায় খ্যাতনামা কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' [১৫৪০] নামক কাব্য অনুসারে রচিত। এটি একটি প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীই প্রধান চরিত্র। তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পদ্মাবতী রূপে গুণে অতুলনীয় নারী। শুধু রূপযৌবনই নয়, মানবিক গুণেও তার চরিত্র উন্নত ও মহান।

কবি হিসেবে আলাওলের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, জায়সীর আধ্যাত্মিক রসের কাহিনিকেই কেবল নয়– চরিত্রগুলোকেও মানবিক রসের আধারে নির্মাণ করেছেন; এর মধ্যে অন্যতম পদ্মাবতী চরিত্রটি। পদ্মাবতী আলাওলের মানসকন্যা। হৃদয়ের সবটুকু রস, সবটুকু আবেগ ও সবটুকু সৌন্দর্য ঢেলে দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছেন। ফলে 'পদ্মাবতী' কাব্যের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ফুটে উঠেছে পদ্মাবতীর রূপের অপরূপ দ্যুতি; অপরূপ রমণীয় সৌন্দর্যে পদ্মাবতী হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের প্রতিমা। কবি পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করেন–

পদ্মাবতীর রূপ কি কহিমু মাহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি ত্রিজগত মাঝ ॥

খ. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী : আলাওল পদ্মাবতীর পর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'র বাকি অংশ রচনা করেন। রোসাঙ্গ রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার অন্যতম সচিব সোলেমানের অনুরোধে দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত কাব্যখানি ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আলাওল সমাপ্ত করেন। আলাওল তার কাহিনি রূপায়ণে দৌলত কাজীর মতো প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারেননি।

গ. সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল : আরাকান রাজ্যের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের উৎসাহে কবি আলাওল ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর কবি নিরুৎসাহিত হয়ে কাব্য রচনা বন্ধ রাখেন। পরে আনুমানিক ১৬৬৯ সালে সৈয়দ মুসার অনুরোধে তা সমাপ্ত করেন। এ কাব্যের কাহিনির উৎস 'আলেফ লায়লা' বা আরব্য উপন্যাস। কবি আলাওল 'আলেফ লায়লা'র ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে তাঁর কাব্যে রূপ দেন। কাব্যটি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

উপসংহার : মধ্যযুগের প্রণয়কাব্যগুলো মুসলিম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুসলমান কবিরা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলো রচনা করে বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। হিন্দি, আরবি, ফারসি উৎসজাত এ প্রণয়কাব্যগুলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবিগণ রোমান্টিক কাব্য ধারার ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিকার অর্থেই অনন্য।

■ প্রশ্ন : গ ॥ বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলিম সাহিত্যিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান অসামান্য। কিন্তু গদ্যের বিকাশে মুসলমানদের এ কৃতিত্বের পথ নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। কেননা মুসলমানরা সে সময় ইংরেজদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন বিমুখ। পরবর্তীতে মনোভাব ও দৃষ্টি পরিবর্তন করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সাহিত্য তথা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, খন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলমান সাহিত্যিকদের ভূমিকা

বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলমান সাহিত্যিকগণের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন বাঁধা, কৌশলগত অনভিজ্ঞতা থাকায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক। যখন এদেশের মুসলমানরা সাহিত্যে বীতস্পৃহ, বাংলা সাহিত্যের সাথে তাদের কোনো সম্বন্ধ নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না তখন মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) দিয়েই আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের উপন্যাস রচনার সূচনা হয়। তিনি বহুমুখী প্রতিভার বলে মুসলিম বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয়ত, তৎকালীন মুসলমান মনীষীবৃন্দ ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) এ উদ্দেশ্যে 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে ১৮৬৩ সালে একটি সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ও স্বকীয় অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করুক– এই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। এ ধরনের প্রচেষ্টার ফলেই দেখা যায়, মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

তৃতীয়ত, সে আমলের মুসলমান রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, মুসলমান লেখকদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের ভূমিকা থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নমুনা বিরল ছিল না। মুসলমান ও হিন্দু লেখকদের মধ্যে যে স্বতন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান এ দুই ধারা সম্মিলিত হয়েই রয়েছে গঙ্গা-যমুনার মতো। ভবিষ্যতেও দুয়ের এ অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে কি-না সেটি হয়তো নির্ভর করবে তাদের পরস্পরের

ভবিষ্যৎ সামাজিক সম্বন্ধের উপর। তবে একালের বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চিন্তাধারা রূপলাভ করতে চাচ্ছে যার পরিপূর্ণ বিকাশে মুসলমান সমাজ উদ্ভূত সাহিত্যিক বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয়।"

চতুর্থত, মুসলমান সাহিত্যিক হিসেবে নজরুলের অবদানও ব্যাপক। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র কাব্যের জ্যোতিও নজরুলের সাহিত্যকে নিষ্প্রভ করে দিতে পারেনি। শুধু রচনার জন্য নজরুল কোনো সাহিত্য রচনা করতে চাননি; মানবতার কল্যাণের জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনগীতি রচনা করেছেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি গদ্য সাহিত্য রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। যুগবাণী, সত্যবাণী, ধর্ম ও কর্ম, দুর্দিনের যাত্রী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। তাঁর গদ্য সাহিত্যে হিন্দু-পুরাণ এবং ইসলাম ধর্মের ইতিহাস ও সংস্কৃতি যুগপৎ লক্ষণীয়।

পঞ্চমত, একদল লেখক ছিলেন গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁরা হিন্দুরচিত বাংলা সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বনে সাহিত্য সাধনা করে হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছেন। স্বাতন্ত্র্যপন্থি একদল সাহিত্যিক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যের কথা অনুভব করেছেন। সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী– এ দুই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে দুই ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। যার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

ষষ্ঠত, পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে সৃষ্ট আধুনিক সাহিত্যের ধারাটি অনুসরণ করেন মীর মশাররফ হোসেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা অনুসরণ করে মুসলমান সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাবশাসিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমানদের অনুসৃত এ ধারার বিশেষ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য এ ধারার অনুসারী মুসলমান সাহিত্যিকগণকে সমন্বয়পন্থি বলা যায়।

সপ্তমত, ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। 'সুধাকর'-কে কেন্দ্র করে এ পর্যায়ের কিছু মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে তাঁরা 'সুধাকর দল' নামে চিহ্নিত। তাঁদের রচিত সাহিত্যকে 'ইসলামি সাহিত্য' বলে অভিহিত করা যায়। এ দলটির পশ্চাতে একটি ধর্মীয় অনুভূতি কার্যকরী ছিল। তবে তাঁরা কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। নিজেদের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য তাঁরা ছিলেন স্বাতন্ত্র্যকামী। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁরা দেখাননি। দেশের ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের মুসলমানেরা বাঙালি রূপেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক এ ধারার উদ্বোধন এবং কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের মাধ্যমে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা অনুসৃত হতে দেখা যায়।

অষ্টমত, মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থা কার্যকরী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় খ্রিস্টধর্মের গ্রাস থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য কয়েকজন মহান ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তাঁর অনুগামী মুন্সী জমিরুদ্দিনের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সে আমলে একটি বিশেষ দল সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ দলটি 'সুধাকর দল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নবমত, বাংলা গদ্যের বিকাশে ফররুখ আহমদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা তাঁর ইসলামের ইতিহাসের গতিশীলতার প্রতি সমর্থন ছিল। তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান একটি কাব্যশরীর নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা কবিতার প্রবৃত্তির মধ্যে নতুন একটি মাত্রা তিনি সংযোজন করেছিলেন। যেমন– সিরাজুম মুনীরায় ও সাত সাগরের মাঝি'র ধ্বনিগত অনুবর্তন প্রকাশ পেয়েছে।

দশমত, ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং হিন্দুয়ানি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে মুসলমানদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা ছিল সুধাকর দলের অপরিসীম কৃতিত্ব। সুধাকর দলের আবির্ভাবের পূর্বে কোনো কোনো মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও মুসলিম জাতীয় জীবনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এ সুধাকর দল। মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক জাতীয় সাহিত্যের বিকাশে এ লেখকদলের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালের মুসলমান সাহিত্যিকগণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পথিকৃৎ হিসেবে এ দলের বিশেষ ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। এ দলের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ, জীবনী, দর্শন, তত্ত্বালোচনা, কুরআন ও হাদিসের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা ইত্যাদি। এ সময়কার মুসলিম রচিত সাহিত্যে গদ্যের আধিক্য দেখা যায়। জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে ধর্ম ও ইতিহাস আলোচনায় গদ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিকগণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

উপসংহার : বাংলা গদ্যের বিকাশে মুসলমান সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ছিল যথেষ্ট বিলম্বিত। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর এদেশে ইংরেজ আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আবার বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতাও দায়ী। তথাপি বাংলা গদ্য বিকাশে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ, প্রকাশ, বিকাশ ও প্রচারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অপরিসীম। এ কলেজ থেকেই বাংলা গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন শুরু হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস হলেও ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরী ছিলেন এ কলেজের কর্ণধার। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ চালু হলে তিনি বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৫৪ বছর স্থায়ীকালের শেষের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তবে গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ হিসেবে ১৮০১–১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়।

পটভূমি : লর্ডওয়েলেসলি ছিলেন তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ ভার নিয়ে বিলেত থেকে যেসব সিভিলিয়ান কর্মচারী আসে, তাঁরা অধিকাংশ চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি, এদেশেও তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই দেশীয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিয়ে এ সকল সিভিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এ কলেজে বাংলা বিভাগ প্রবর্তিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন শ্রীরামপুরের পাদ্রি ও বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরি। তিনি তাঁর অধীন দুইজন পন্ডিত ও আরও ছয় জন সহযোগী পন্ডিতদের সহযোগিতায় বাংলা গদ্য কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপণ করা হয়। ওয়েলেসলি কিছু বিলাতী সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান প্রদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে ১৮০১–১৮১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ৮ জন লেখক মোট ১৩টি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন।

বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান/ভূমিকা : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কয়েকজন কৃতি ব্যক্তিত্ব যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উল্লেখযোগ্য। এঁদের মেধা ও মনন বাংলা গদ্যের সূচনা ও বিকাশের পথকে সুগম করে। নিচে কতিপয় লেখকের নাম, তাঁদের রচিত পুস্তকের নাম এবং তাঁদের অবদান/ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১.	উইলিয়াম কেরি	:	কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)।
২.	রামরাম বসু	:	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।
৩.	গোলোকনাথ শর্মা	:	হিতোপদেশ (১৮০২)।
৪.	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	:	বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮০৩)।
৫.	তারিণীচরণ মিত্র	:	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)।
৬.	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	:	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র (১৮০৫)।
৭.	চণ্ডীচরণ মুন্সী	:	তোতা ইতিহাস (১৮০৫)।
৮.	হরপ্রসাদ রায়	:	পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)।

উইলিয়াম কেরি : উইলিয়াম কেরি ভারতের বহু ভাষায় অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরি কেবল বাংলা বিভাগ পরিচালনা করেননি, তিনি নিজেই নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ হলো 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'। 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির লোকের মুখের ভাষার একত্রীকরণের ফসল 'কথোপকথন'। অবশ্য গ্রন্থটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কেরির রচনা কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতেন। তবে কেরির নামে প্রকাশিত বলে এর সকল কৃতিত্ব কেরিরই প্রাপ্য। 'কথোপকথন' গ্রন্থটি ছিল দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি। উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় দেড়শত ইতিহাস আশ্রিত গল্পের সমন্বয়ে 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ সালে মুদ্রিত হয়। কেরি পরিচ্ছন্ন ভাষাতে গল্পগুলোকে সরল ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেন। গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবে বা উত্তরণে 'ইতিহাসমালা'র অবদান উল্লেখযোগ্য।

রামরাম বসু : রামরাম বসু ছিলেন উইলিয়াম কেরির সহযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক, যার লিখিত বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। বাংলা গদ্যের পুরোভাগে তার অবস্থানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কেরির অনুরোধে তিনি ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সহকারী পন্ডিতরূপে যোগদান করেন। তিনি দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং অন্যটি হলো 'লিপিমালা'। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ফারসি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রচিত হলেও বাংলা গদ্যে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস এই বইটি। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় 'লিপিমালা'। এটা রামরাম বসুর একটি ভিন্নধর্মী কাল্পনিক পত্রগুচ্ছের সমষ্টি। পত্রাকারে লিখিত কতকগুলো পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় বিষয় আছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থে প্রথম বইয়ের মতো ফারসি শব্দের প্রতুলতা নেই; বরং এর রচনারীতি সহজ-সরল ও মৌখিক রীতির কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তৎকালীন প্রচলিত গদ্যরীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামরাম বসু রচিত গদ্যগ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের গদ্যসাহিত্য প্রচলনের উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে সফল ও সার্থক করেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : উইলিয়াম কেরির অধীন প্রধান পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শুধু অধ্যাপক পন্ডিতই ছিলেন না, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতিও সে আমলে প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষার বিদগ্ধ পন্ডিত। মার্শম্যানের মতো মিশনারি দল তাঁর কাছে বসে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের কারণে মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ পর্যন্ত এ কলেজে চাকরিরত ছিলেন এবং অধ্যাপনাকালে তিনি পাঁচটি বাংলা বই লিখেন। বইগুলো হলো 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), হিতোপদেশ (১৮০৮), 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩)। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে অনুবাদ ও নিজস্ব সৃষ্টি গ্রন্থ আছে। তিনি অনুবাদগুলোতে সংস্কৃত অনুসারী ও চলিতভাষা এ দুই রীতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর লেখায় সতেজ প্রকাশভঙ্গি এবং সরল শব্দবিন্যাস বাংলা গদ্য প্রসারের পথকে সুগম করেছিল। বাংলা গদ্যের ভাষাকে উদ্দেশ্যানুগ ও বিষয়োচিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

গোলোকনাথ শর্মা : গোলোকনাথ শর্মা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক না হয়েও মিশনারিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর রচিত 'হিতোপদেশ' ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইটি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হলেও কথ্যরীতির অনুসরণে গদ্যের প্রাঞ্জলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

চন্ডীচরণ মুন্সী : চন্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি বইটি ফারসি হতে অনুবাদ করেন। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত এ গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' ১৮০৫ সালে রচিত। এ গ্রন্থে ইতিহাসের বিষয়বস্তু স্থান পেলেও কাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। গ্রন্থটি বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লেখা। বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত।

তারিণীচরণ মিত্র : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানি বিভাগের দ্বিতীয় মুনশী তারিণীচরণ মিত্র ইংরেজি থেকে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' নামক অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থেও তাঁর নাম রয়েছে। সংগতকারণেই বলা যায়, তিনি বাংলা গদ্যের বিকাশে ভূমিকা রাখেন।

হরপ্রসাদ রায় : হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা। গ্রন্থের রচনারীতি সরল ও প্রাসাদগুণ বিশিষ্ট। শিক্ষাপ্রদ উপদেশাত্মক গল্প ছাড়া এই গ্রন্থের তেমন কোনো নতুনত্ব নেই।

উপসংহার : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখলেও প্রথম পনেরো বছর শেষে বাংলা গদ্যের উপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথা ইংরেজ মিশনারিদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তবুও বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কোনো মহৎ ও স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী ও প্রেমিক-এ দুই ধারায় পরিগণিত করা যায়। কালের চেতনা তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যিক জীবনে গভীরভাবে স্পন্দিত। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তাঁর এক-একটি কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে আর সমগ্র বাঙালি শিহরিত হয় এক নতুন শক্তিতে। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর এক হাতে রণতূর্য' নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন বিদ্রোহী এবং প্রেমিক কবি। একদিকে তিনি চিরসুন্দরের সাধনা করলেন, অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিসৈনিকরূপে রণতূর্যবাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নর-নারীর হৃদয়লীলা তাঁকে যেমন বিচলিত করেছিল তেমনি অন্যায়ভাবে শোষণ-শাসনের নির্মমতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

বিদ্রোহী কবি/সাহিত্যিক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা/অবদান : বাংলা কাব্য সাহিত্যে কবি নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। নিচে বিদ্রোহী কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যচর্চা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

কাব্যচর্চার সূচনাপর্ব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে নজরুল সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং এই অবস্থাতেই ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'মুক্তি' নামে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি পাঠক মহলে প্রভূত সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। তদবধি তিনি নিজেও 'বিদ্রোহী কবি'-রূপেই পরিচিত হয়ে আসছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার পর থেকে তিনি সাহিত্য ও সংগীত সাধনাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। রাজদ্রোহাত্মক কাব্য রচনার দায়ে তাঁকে রাজরোষেও পড়তে হয়েছে।

কবির বিদ্রোহী সত্তা : বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে, বস্তুত তাঁর সমগ্র কাব্যচেতনার মধ্যে বিদ্রোহই সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের পশ্চাতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা ছিল নিশ্চিত, কিন্তু তাই সব নয়। কেননা তাঁর বিদ্রোহ ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসংগতির বিরুদ্ধেও। ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, অত্যাচার এবং সামাজিক অবক্ষয় ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে মানব মুক্তির তীব্র বাসনা জেগে ওঠে নজরুলের মনে। তিনি দেশকালের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে দুঃশাসন-অপশাসনের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী' কবিতায় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–

মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

নজরুলের সাহিত্য প্রতিভা : নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্য প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। তেইশ বছরের প্রাগজীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, জন্মের পর প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং বহু বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় বাধা-সংকটের ভিতর দিয়ে যৌবন অতিক্রম এবং পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং ইচ্ছা যুগপৎভাবে কাজ করেছিল, যা তাকে অনিবার্যভাবে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। মূলত কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত অবহেলিত সর্বোপরি দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জয়গানে উচ্চকিত। তাঁর চিন্তা-চেতনায় বিদ্রোহের স্বরূপ-সূচনা ও সূতিকাগারে 'অগ্নিবীণা' কাব্য থেকেই একথা একবাক্যে স্বীকার্য। তিনি সমস্ত আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খল ভেঙে এগিয়ে যেতে চান, সামাজিক শৃঙ্খলকে পদদলিত করেন, গোঁড়ামি আর সাম্প্রদায়িকতাকে ইতিহাস থেকে বিদূরিত করতে চান, ধ্বংসের আহ্বানে তিনি নিরলস। কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এর মাধ্যমে কবি বিদ্রোহের-আগুনখেলার ঘোষণা দিলেন তরুণদের এভাবে–

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
"তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

কবি নজরুল ইসলামি সংগীত রচনায় যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সম্ভবত সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শ্যামাসঙ্গীত রচনাতেও। তাঁর পারিবারিক জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে সমগ্র বিশ্ব জুড়েই যে মানবজাতির মনে একটা বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং সমকালে রাশিয়ায় যে একটা আমূল পরিবর্তিত হয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, তারই উদ্দীপনায় নজরুল দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। নজরুলের উদ্দীপনাময়ী বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলো যুবমানসে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তাঁর 'চিত্তনামা' কাব্যের বিষয় হলো– দুরন্ত যৌবনে আবেগ, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মানবতা। 'সর্বহারা' কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্যের চিত্র। এখানে কবি ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ঘুচিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। 'দোলনচাঁপা' কাব্যে প্রেম, আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রাধান্য বিস্তার করেছে। 'দারিদ্র্য' কবিতায় উদ্বেলিত যৌবনোচ্ছ্বাসে কবি মানবতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। যেমন– তিনি বলেছেন–

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।

সাম্যবাদী কবি : কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বিষয়-বিন্যাসে অনেকবার বাঁকপরিবর্তন ঘটেছে। 'নবযুগ' পত্রিকা পর্বে আমরা কবিকে বিদ্রোহী ভূমিকা, 'ধূমকেতু' পর্বে তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা এবং 'লাঙ্গল' পর্বে এসে সাম্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। 'সাম্যবাদী' গ্রন্থের কবিতাগুলোতে শ্রেণি বৈষম্য বা শ্রেণি সংগ্রামের তুলনায় সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সমতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই কবি সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চাষি, শ্রমিক, কুলি-মজুর এবং কি চোর ডাকাত, বারাঙ্গানা পর্যন্ত তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে।

মানবতার কবি : কবিসত্তা হলো সামাজিক জাগরণ ও সমাজসত্তার বিপ্লবী চেতনার প্রতিনিধি, সকল দেশের, সকল মানুষের ধ্যান আর স্তবগান তাঁর কাব্যকর্ম– এ ধারার কাব্য হিসেবে 'সর্বহারা' কাব্যটি স্বতন্ত্র। এ কাব্যটিতে একাধিক ভাব এবং বিষয়ের সম্মিলন ঘটেছে। তবে কাব্যটির মূল সুর নিহিত আছে সর্বহারা মানুষদের মঙ্গল কামনায়। কাজী নজরুল ইসলাম কেবল সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্তির কথাই প্রকাশ করেছেন তা নয়– এ কাব্যে তিনি শ্রেণিহীন সর্বক্ষেত্রে শোষণ-শাসন মুক্ত সমাজের বাস্তব চিত্রও এঁকেছেন। শুধু কাব্য রচনার জন্য তিনি কাব্য রচনা করতে চাননি। মানবতার কল্যাণের জন্য তিনি কাব্য রচনা করেছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন, সমকালের মানবসমস্যা তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে। তিনি বলেছেন–

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো–যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত–লেখায় তাদের সর্বনাশ!

কবিতা ও গানে বিদ্রোহ : 'বিষের বাঁশী'র অধিকাংশ কবিতা ও গান বিদ্রোহের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির। এ কবিতা ও গানগুলোতে যে উদ্দীপন ভাব যুগিয়েছে তা হলো– পরাধীনতার জ্বালাবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশের দুঃখ-বেদনার প্রতি গভীর সমবেদনাবোধ। পরাধীনতার অভিশাপের বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রেমের নিজস্ব মূর্তি নির্মাণেই 'বিষের বাঁশী'র বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কাজী নজরুল

একদিকে যেমন বিদ্রোহী– তেমনি অন্যদিকে তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রেমিকসত্তা। কবির রোমান্টিক-প্রণয়মূলক কবিতায় কবির আকুতি-মোহময়তার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ধরনের কাব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ছায়ানট', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চোখের তারা', 'চক্রবাক', 'ফণিমনসা' প্রভৃতি। 'সব্যসাচী' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন–

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে, হিমালয়–চাপা প্রাচী!
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি!'
মণ–যৌবন জলতরঙ্গে নাচেরে প্রাচীন প্রাচী!

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার ইতিহাসে যত না বড় কবি– তাঁর চেয়ে বেশি তিনি জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতায় তিনি মুক্তির কথা বলেছেন– বলেছেন সাম্যের কথা– প্রকাশ করেছেন হৃদয়ের গোপন কথা। বাংলা কবিতার ধারায় তিনি হিন্দু পুরাণ-মুসলিম ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই ব্যবহার এতটাই সহজ ও প্রাসঙ্গিক হয়েছিল যে, হিন্দু-মুসলিমসহ সব জাতি-পেশার মানুষই তাঁর কবিতাকে সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কবি বলতেন–

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রাণ প্রবাহের কবি। তাঁর কাব্যকথা ছিল উল্লাসিত জীবনের জয়গানে মুখরিত। 'অগ্নিবীণা'র শ্রেষ্ঠ কবিতা হলো 'বিদ্রোহী'। এই কবিতার নাম অনুসারে নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। এখানে তিনি ঘোষণা করেছেন–

আমি চির-বিদ্রোহী বীর–
আমি বিশ্ব ছাড়িয়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত– শির!

প্রচলিত ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, শোষক ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ছিল। সমাজের সমস্ত রকম কুসংস্কার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সময়োচিত ছিল।

■ প্রশ্ন : চ ॥ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলতে কী বুঝ? প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্য নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ। চর্যাগীতিকাগুলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতিমূলক গান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধ্যাভাষায় রূপকের মাধ্যমে সাধকদের গূঢ় ধর্মসাধনার কথা প্রচার করা। চর্যাপদগুলোর রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত না হলেও নানা আলোচনা হতে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাতে জানা যায় যে, এগুলো দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক মতে, এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল শুরু হয়। এ সময় চর্যাপদকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থায় নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার যেসব রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ : চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে চর্যাপদের রচনাকাল মনে করেন এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ থেকে ১১০০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে চর্যাপদের রচনাকাল বলে ধারণা করেন। আর এ সময়কেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে মতবিরোধ যাই থাক, চর্যাপদের আবিষ্কারক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে বাংলা ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা বলে যে ধারণা ব্যক্ত করেন তা সর্বজনস্বীকৃত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চর্যাপদ' শুধু উল্লেখযোগ্য প্রাচীন নিদর্শন হিসেবেই নয়, চর্যাপদের রয়েছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলো হচ্ছে– ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব, ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব, তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্ব, নান্দনিক গুরুত্ব, সাহিত্যে প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে চর্যাপদের গুরুত্ব এবং প্রেম ও বেদনার চিত্র উপস্থাপনে গুরুত্ব। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব : চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা বাংলা, শৌরসেনী, অপভ্রংশ প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া ও অসমিয়া শব্দের বাহ্য ও আংশিক ব্যবহার লক্ষ করেই কেউ কেউ চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন। উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ বিবেচিত এবং ভাষা সাহিত্যের পাঠ্য হিসেবে সূচিভুক্ত। চর্যাপদকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সকলের ভাষা একরূপ হতে পারে না; প্রাচীনত্বের জন্য গৌড় অপভ্রংশের প্রভাবও এতে রয়ে গেছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, শান্তিপার ভাষা মৈথিলি এবং কাহ্নপা, ভুসুকুপার ভাষা প্রাচীন বাংলা বঙ্গকামরূপী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ছন্দের ভিত্তিতে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, চর্যার পদসংকলনটি আদিমতম বাংলা ভাষায় রচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর গানগুলো হেঁয়ালি ধরনের সাংকেতিক ভাষায় লেখা। এ পদগুলো প্রতীক ও রূপকাশ্রিত। পদগুলোর বাইরের অর্থ অনেকটা সরল ও বোধগম্য হলেও সেগুলোর আড়ালে রয়েছে ধর্মীয় নানা আধ্যাত্মিক অর্থ। সে অর্থ বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য। চর্যার গভীরতর অর্থের নেপথ্যে বিরাজিত সাধন তত্ত্বের রূপকার্থই প্রধান। সন্ধ্যার মতো আলো-আঁধারের অস্পষ্টতায়

রহস্যময় বা হেঁয়ালিপূর্ণ বলে এগুলোকে বলা হয় 'সন্ধ্যাভাষা' বা আলো-আঁধারি ভাষা। চর্যার ভাষা অসমিয়া কিংবা হিন্দি বা অপভ্রংশ নয়– কারণ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার পূর্ববর্তী স্তর অপভ্রংশ। অন্যান্য ভাষার কিছু লক্ষণ চর্যাগীতিকায় বিদ্যমান থাকলেও তাকে ঐ ভাষাগোষ্ঠীর বলে দাবি করা যৌক্তিক নয়। এটাই যৌক্তিক যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।

ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব : চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে। চর্যাপদগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধ্যাভাষায় রূপকের মাধ্যমে সাধকদের গূঢ় ধর্মসাধনার কথা প্রচার করা। এগুলোতে বৌদ্ধমতের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির কথা আছে। চর্যাপদের কতকগুলো বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাতে জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের দোলা থেকে মুক্তি লাভের এবং সহজ অবস্থার রূপ মহাসুখ-নিবাসে পৌঁছার ঠিকানা আছে। পদকর্তাদের ভাষায়–

তীণি ভূষণ মই বাহিঅ হেলে।
হউ সুতেলী মহাসুহ লীলে ॥

চর্যাপদে প্রাচীন ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক চিত্রের সমন্বয় ঘটেছে। সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন বরাবরই স্পষ্ট। যুগে যুগে জীবনাদর্শের পরিবর্তনের ছাপ ফুটে উঠে সাহিত্যে। সে পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়ে সাহিত্য যুগে যুগে নতুন বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়।

তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্ব : চর্যাপদে যে সমাজের চিত্র পাওয়া যায় তা একান্তভাবে বাংলা-বাঙালির নয়– সমগ্র পূর্ব ভারতের। চর্যাপদে যাদের চিত্র পাওয়া যায় তারা ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, নদী, নৌকা, সাঁকো, ঘাট, পাটনী, মূষিক, তুলো, সোনা-রুপা, মদ, অবৈধ প্রেমকাহিনি, প্রতিবেশ, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। সমাজের নিচুস্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে প্রতিফলিত হয়েছে। চর্যাপদে যে সমাজচিত্রের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে তা এক সময় মানুষের সামাজিক অবস্থানকেই প্রকাশ করে। চর্যাপদে যে জীবনধারার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে– তাতে উচ্চ জীবনধারার পরিচয় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পদে অন্ত্যজশ্রেণির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেদনাবিধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

নান্দনিক গুরুত্ব : বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের একটি নান্দনিক গুরুত্ব রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার আড়ালে পদকর্তাগণ সেখানে মানবজীবনকেই আশ্রয় করেছেন এবং সাহিত্যকে পদবাচ্য করে তুলেছেন। চর্যাপদগুলোর প্রকাশভঙ্গিতে পরিমিতিবোধ আছে। এই পরিমিত প্রকাশভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লক্ষণ। চর্যাকারগণ মিতভাষণের মাধ্যমে অতি চমৎকারভাবে প্রত্যক্ষ জিনিসের ছবি তুলে ধরেছেন। যেমন–

ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু'আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥

চর্যাপদে ভাষার ক্ষেত্রে অর্থালংকার ও শব্দালংকারের সুষম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করলে দেখতে পাই এর রূপরস কাব্যময়। শাস্ত্রানুযায়ী অলংকার দুই শ্রেণির– শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারের মধ্যে চর্যাপদে সর্বাধিক অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চর্যাপদে এর অভাব নেই। যেমন–

ভব নিব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি কর– কশালা ॥

সাহিত্যে প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে চর্যাপদের গুরুত্ব : চর্যাগীতিকারগণ সংস্কৃত কাব্যের রীতিতে পদ রচনা করেননি। তাঁদের সহজ-সরল প্রচেষ্টা ও প্রকাশের ভঙ্গিতে নতুন ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। যুগযুগান্তরের সীমা পার হয়ে সে ছন্দ ও সুর আজও বাংলার জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। ভাবের কেতাবী বন্ধনকে ভেঙে কবিরা তাকে লোকায়িত করে তুলেছেন। তাই জয়দেবকে সংস্কৃত রীতিনীতি বর্জন করে সম্পূর্ণ অভিনব কাব্য করতে এবং অলৌকিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে সম্পূর্ণ লৌকিক মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখা যায়। চর্যার গানে বিভিন্ন প্রকার রাগের উল্লেখ রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দ' ভণিতার প্রয়োগ দেখা যায়। তার পূর্বে কোনো কবি ভণিতার প্রয়োগ করেননি। তাছাড়া চর্যাপদের ন্যায় গীতগোবিন্দের প্রত্যেক শ্লোকে মিল রয়েছে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ভণিতা ও রীতিতে জয়দেব তাঁর পূর্ববর্তী চর্যাপদ হতে প্রেরণা পেয়েছিলেন। 'গীতগোবিন্দই' বৈষ্ণব পদাবলির আদি উৎস। আবার বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' জয়দেবের কয়েকটি পদের অনুবাদ রয়েছে। তাছাড়া চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রত্যেক পদের শীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে এবং প্রত্যেক পদের শেষে ভণিতা আছে। চর্যাপদ যে বৈষ্ণব পদাবলির আদি উৎস তাও লক্ষ করা যায় চর্যাপদগুলোর গানে। আর এ গানের ধারা বৈষ্ণব পদাবলি হতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল পর্যন্ত চলে গেছে। চর্যাপদগুলো রূপকের আবরণে রচিত। আর এ গীতিকাগুলো ভণিতাযুক্ত। পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব পদাবলিই নয়, সমসাময়িক সমগ্র বাংলা কাব্যে চরণের শেষ অনুপ্রাস ও পদের শেষে ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। তদুপরি ভাব, ভাষা, গান প্রভৃতি দিক থেকে পদাবলির সাথে চর্যাপদের নিবিড় সংযোগ পরিলক্ষিত হয়।

প্রেম ও বেদনার চিত্র : চর্যাপদে প্রেম-বেদনা ও রসের কথা আছে, নীরস ধর্মতত্ত্বগুলোকে রসমণ্ডিত করে তোলার জন্য চর্যাকারগণ কাব্যকে আদি রসাত্মক করে তুলেছেন। তাই বহু চর্যাতে শৃঙ্গার রসাত্মক রূপক লক্ষ করা যায়। যেমন–

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই ॥

উপসংহার : চর্যাপদের সাহিত্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। এসব পদগুচ্ছে তৎকালীন সাধারণ বাঙালির প্রতিদিনের ধূলিমলিন জীবনচিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার টুকরো টুকরো রেখাচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন এবং আদি বাংলা সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এটি আবিষ্কৃত না হলে আদি যুগের বাংলা ভাষা অজ্ঞাতই থেকে যেত। সুতরাং চর্যাপদই বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন এবং নানা দিক থেকে এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

■ প্রশ্ন : ছ ॥ টীকা লেখ :

(১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,

(১) ইউসুফ-জুলেখা।

উত্তর ।। (১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের আবির্ভাব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রোমান্টিক প্রণয় কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে। মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম কবিরা ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনির প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিগণ হিন্দু ধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারি, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন। ড. সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, রোমান্টিক কাহিনি কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের সর্বদাই একচ্ছত্রতা বিরাজমান ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদেবীর কল্পনার অবকাশ ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় এ কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট। ধর্মের গন্ডির বাইরে এই শ্রেণির জীবনরসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান রচিত হয়েছিল বলে তাতে এক নবতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক রাজ-রাজড়ার কাহিনি থাকলেও সেখানে প্রধান আবেদন মানবপ্রেম। এসব কাব্যে ধর্ম নেই, আছে জীবন। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহের কথা লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে আনন্দ রসের নতুন ভুবন রচিত হয়েছে। কাব্যগুলোর বিষয়বস্তু মৌলিক নয়। ইরান ও ভারতের সুফি কবিগণ আধ্যাত্মিকমার্গের এই তত্ত্বের ভিত্তিতে রোমান্স কাব্য রচনা করেন। তারা রূপক হিসেবে মানবের প্রেম কাহিনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের প্রেমকথা নিয়েই প্রণয়কাব্যের ধারা, কবিগণ মধুকরী বৃত্তি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য থেকে সুধারস সংগ্রহ করে প্রেমকাব্যের মৌচাক সাজিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। মুসলমান কবিরাই এ কৃতিত্বের অধিকারী।'

রোমান্টিক প্রণয় কাহিনিগুলো মধ্যযুগের ধর্মশাসিত বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত। কাহিনির ভাষান্তরকরণেও কবিগণ মৌলিকতার স্পর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। অনুবাদ নয়, তারা ভাবানুবাদের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ফলে প্রণয়োপাখ্যানগুলো মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত। বিদেশি গল্পের অস্থিতে বাংলা রক্তমাংস সংযোজিত করায় তা মৌলিকত্ব অর্জন করেছে। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর একটা অংশ আরাকান রাজসভার কবিগণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। আরাকান রাজসভার কবিগণের বিস্ময়কর প্রতিভা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা অতিক্রম করে মানবীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার। কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আলাওলের মতো প্রতিভাবান কবি আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রোমান্টিক কাব্য রচনা করেছিলেন। দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, কোরেশী মাগন ঠাকুরের চন্দ্রাবতী, আলাওলের পদ্মাবতী এবং সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কাব্য হিসেবে বিবেচিত।

(২) ইউসুফ-জুলেখা।

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুর বাদশার কন্যা জোলেখা আজিজ মিশরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফকে বশীভূত করতে পারেননি। বহু ঘটনার পরিবর্তনে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পারেননি এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মিলন হয়। এই প্রধান কাহিনির সঙ্গে আরও অসংখ্য কাহিনি ঐ কাব্যে স্থান পেয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। কবি প্রেমরসে ধর্মবাণী প্রচার করতে চাইলেও তা মানবীয় প্রেমকাহিনি হিসেবেই রূপলাভ করেছে। ইরানের সুফি কবিরা ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনিতে যে রূপক উপলব্ধি করেছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর তাকেই কাব্যের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, ইউসুফ-জোলেখা ভাবুক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা। প্রেমের মাধ্যমে উভয়ের মিলন সম্ভব। কবি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানবিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবেই কাব্যটি গ্রহণযোগ্য। জোলেখার মনে প্রেমের প্রভাবে যে চৈতন্য জাগে তাতে আবাল্যের আরাধ্যা দেবীমূর্তি ভেঙে ফেলে প্রেমাস্পদের ধর্মে দীক্ষালাভ ঘটে। জোলেখার এ মনোযোগ ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন–

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখন্ড,
ব্যর্থ সেবা কৈলু তোক জানিলুঁ তু ভন্ড।
প্রতিমাক পাছাড়িয়া কৈল খন্ড খন্ড,

ভূমিতলে খেপি তাক কৈল লন্ডভন্ড।
কান্দিয়া পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ,
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মনসুখ।

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, 'অবলীলাক্রমে গল্প লিখতে পেরেছেন–এটাই সগীরের কৃতিত্ব। গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা রোমান্টিক কবিদের লক্ষ্য ছিল। দর্শনচিন্তা, তত্ত্বচিন্তা অথবা চরিত্র চিত্রণের প্রতি তাঁরা জোর নজর দেননি। সরস গল্প সৃষ্টি করে নিছক আনন্দের ভোজে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সগীরের কলম সে পথ বেছে নিয়েছে। গল্প রচনা কবির লক্ষ্য বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোনো হিসাব করেননি।'

কবি কাব্যের রূপায়ণে ফারসি উৎসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখাননি বলে কাব্যে কবিপ্রতিভার মৌলিকতার নিদর্শন বিদ্যমান। ফেরদৌসীর কাব্যের ঘটনার সঙ্গে সগীরের অনৈক্য অনেক স্থানেই রয়েছে। বিশেষত ইবন আমিন ও বিধুপ্রভার প্রণয় এবং পরিণয় কাহিনি শাহ মুহম্মদ সগীরের নিজস্ব কল্পনা। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কাব্যটিতে কোনো বিদেশি আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যে রক্তমাংস ও বাংলার আবহ এর প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোনো বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।' শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহাম্মদ।

খ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৩ ও ৪ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

■ প্রশ্ন : ক ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল' প্রবন্ধে সমাজ বাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'তৈল' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সমাজ-বাস্তবতার এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একান্ত মনোভাব ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক প্রত্যক্ষিত নানা ঘটনা, পরিবেশ, পরিস্থিতি নিয়ে তিনি এক রসালো মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়া তৎপরবর্তীকালের বাস্তবতার প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতাও এখানে বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে।

'তৈল' প্রবন্ধে বিধৃত সমাজ-বাস্তবতার চিত্র

সমাজে তৈলের শক্তির স্বরূপ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'তৈল' প্রবন্ধে সমাজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা তৈলের শক্তিকে প্রতীকীভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়, যে কাজকে সহজে করা যায় না তা কিন্তু এ সমাজের মানুষ তৈল প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই সাধ্য করতে পারে। তৈলকে তাই সর্বশক্তিময় বলা হয়েছে। তৈলের বদৌলতেই সমাজের মানুষ সবকিছুকে সোজাভাবে পেয়েছে।

তৈল দেওয়ার বিদ্যা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন যে, তৈল দেওয়ার বিদ্যার বলে মানুষ কীভাবে নিম্ন অবস্থান থেকে উচ্চতর পর্যায়ের জীবনধারণ করতে পারে। এ সমাজে আমরা দেখি, যে তৈল দিতে পারে তার চাকরির জন্য ভাবতে হয় না। এজন্যই আমাদের সমাজে হাজারো মেধাবী মুখ তার যোগ্যতম চাকরি পায় না। পক্ষান্তরে অযোগ্য, কম মেধাবীরা শুধু তৈল দেওয়ার জোরে রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলোতে বসে নিজের সুখ উদ্ধার করছে। আসলে তৈল দেওয়ার বিদ্যা যে ক্ষেত্রবিশেষে কত ভয়ংকর হতে পারে সে সত্যটি প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন।

আমাদের সমাজে দেখি, যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় তখন তা সমাধানের জন্য দুই পক্ষকেই কথা নামক তৈল প্রদান করা হয়। এ কথাই দুই পক্ষকে শান্তি-শৃঙ্খলার বাতায়নে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তৈলের ভূমিকা যে ইতিবাচক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাবন্ধিক স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, পিতাপুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় যে বিবাদ লাগে তাতে তৈলই ঠান্ডা করে। তৈলের ক্ষমতা অপরিসীম।

তৈল দেওয়ার পাত্র ও কৌশল : প্রাবন্ধিক আমাদেরকে একটি বাস্তবসম্মত সমাজচিত্র দেখিয়েছেন যে, এ সমাজে তৈল দেওয়ার পাত্র কে নয়? সমাজে আমরা দেখি সকলেই তৈল দিতে পারে। এ বিষয়টিই তিনি তাঁর 'তৈল' প্রবন্ধে বলেছেন। পুঁটে তেলি থেকে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিতে পারে। তৈল দেওয়ার কৌশল হিসেবে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, যে যত বেশি কৌশলী সে তত কম তৈলে কাজ সমাধান করতে পারে। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য-ভাষা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– "তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কাজ হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।" তিনি আরও বলেন, "সময়– যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।"

সমাজে তৈল দেওয়ার প্রবৃত্তি : লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়েছেন, তৈল দেওয়ার প্রবৃত্তি একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতো আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই এই তৈল প্রয়োগ করে থাকে, কিন্তু অনেকে এতো বেশি স্বার্থপর যে, বাইরের লোককে তৈল দিতে পারে না। আর যাদের মধ্যে এই বাইরের লোককে তৈল দেওয়ার প্রবৃত্তি নেই তারা জীবনে জয়ী হতে পারে না। কেননা আমরা বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় দেখি যে, একটি রাষ্ট্র এখন একা কোনোভাবেই বাঁচতে পারে না। একটি রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে অপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে আসলে তৈল দেওয়ার বিষয়টি এমনিতেই চলে আসে। এক অর্থে তৈল দেওয়ার এ প্রবৃত্তি সামাজিক।

বাঙালি সমাজের তৈল প্রদান ক্ষমতা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালির তৈল প্রদান ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাঙালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালির একমাত্র ভরসা তৈল– বাঙালির যে কেহ কিছু করিয়াছে, সকলেই তৈলের জোরে।' আবার তিনি বলেছেন, 'এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।' একথাও বাঙালির স্বভাব-চরিত্রে বিদ্যমান।

উপসংহার : 'তৈল' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক সমাজকে ধরতে চেয়েছেন মানুষের বিবেচনা ও প্রবণতার আলোয় এবং আড়ালের আলো-ছায়ায়। তাই তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত চিত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেবল নিজেকে চিন্তাবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে নয়; বরং অনেককে চিন্তার ভুবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। কারণ বাঙালি সমাজে যেভাবে তৈলবাজ চরিত্রের লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সমাজ পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। 'তৈল' প্রবন্ধে এমন সমাজ-বাস্তবতার চিত্রই প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন।

■ প্রশ্ন : খ ॥ 'তৈল' প্রবন্ধ অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'তৈল' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি চরিত্রের এক নির্মম সত্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাঙালি স্বভাবের সেই নির্মম সত্যটি হলো সুবিধা আদায়ে তোষামুদি করা, তৈলবাজি করা। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তৈল ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। যে যত বেশি তৈল প্রয়োগ করতে পারে, সে তত বেশি সুবিধা লাভ করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সদা তৎপর।

প্রাবন্ধিক বাঙালি চরিত্রের যে নির্মম সত্যচিত্র প্রকাশ/ইঙ্গিত করেছেন/প্রাবন্ধিকের মতামত

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জাঁতাকলে এ অঞ্চলের মানুষ পোষমানা প্রাণীর মতোই প্রভুভক্ত ছিল। শিক্ষাদীক্ষায় তারা অনগ্রসর ছিল। অনগ্রসর ছিল সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতেও। এ সময়টিতে হাতে গোনা কতিপয় মানুষ শিক্ষিত ছিল। এ শিক্ষা তাদেরকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে দেয়নি। তাদের আয়-রোজগার বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং তারা তাদেরকে খুশি করার কৌশল গ্রহণ করতেন। লেখক এ কৌশলকেই 'তৈল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিচে বাঙালি চরিত্রের অন্যান্য সত্যচিত্র/প্রাবন্ধিকের মতামত বর্ণনা করা হলো :

তৈলের সর্বত্র ব্যবহার : প্রাবন্ধিক 'তৈল' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তৈল প্রয়োগ করতে সিদ্ধহস্ত। যে যত বেশি তৈল প্রয়োগ করতে পারে সে তত বেশি সুবিধা লাভ করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে তৈল প্রয়োগের ইতিবাচক দিক থাকলেও এর নেতিবাচক প্রয়োগই বেশি পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সংকীর্ণ, যোগ্যতায় অপরিপক্ব মানুষরাই তৈলকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। বাঙালিরা বরাবরই এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের অস্থিতে, মজ্জায়, চিন্তাচেতনায় তৈল সংস্কৃতি বিরাজমান।

'তৈল' প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের প্রকৃতি : প্রাবন্ধিক 'তৈল' প্রবন্ধে মূলত তোষামোদ ও চাটুকারী স্বভাবকে তুলে ধরেছেন। বাঙালির চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "বাঙালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালির একমাত্র ভরসা তৈল– বাঙালির যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কী কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।"

বাঙালি চরিত্রের স্বরূপ : বাঙালির একমাত্র ভরসা যে তৈলবাজি আচরণ সে বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্দেহাতীতভাবেই একমত। আবার তৈল প্রয়োগ পদ্ধতিও যে সব বাঙালি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাও তিনি তাঁর পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন। তিনি যশ-খ্যাতি যাই হোক, বাঙালির সমূহ সাফল্যের মূলে যে 'তৈল' তা যাপিত-জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিদিনের কর্ম থেকে জেনেছেন। আর 'তৈল' প্রয়োগ বিদ্যায় 'বিলাতি' ডিগ্রি (বিদেশপ্রিয়তা বুঝাতে) কিংবা মাধ্যম হিসেবে 'নারীকে ব্যবহার' করতে পারলে যে সাফল্যের গতি বৃদ্ধি পায় সে কথাও স্মরণ রাখতে বলেছেন লেখক। শেষে বলেছেন, "মনে রাখা উচিত– এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।"

বাঙালির তৈল দেওয়ার কারণ : লেখক সমকালীন বাঙালি চরিত্রে লক্ষ করেছেন, সমাজের প্রতিটি স্তরেই বিদেশিদের খুশি করার, তাদের অনুকম্পা পাওয়ার প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল। অর্থাৎ সবাই তৈল দিতেন। উচ্চস্তরের মানুষেরা তৈল দিতেন পদ-পদবির আশায়, শিক্ষিতরা তৈল দিতেন কেরানিগিরির আশায়, জমিদাররা তৈল দিতেন জমিদারি পাকাপোক্ত করার জন্য, সাধারণ মানুষ তৈল দিতেন দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার আশায়। তারা অদৃষ্টের লিখন মেনে নিয়ে ধরেই নিয়েছিলেন একমাত্র 'তৈল'ই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। সঠিক পাত্রে, সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে তৈল দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাঙালির অপরিপক্বতা ছিল। জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধির অভাবে উপযুক্ত স্থানে সবাই 'তৈল' দিতেও পারতেন না। লেখক বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিয়ে যথানিয়মে তৈল দেওয়ার কৌশল রপ্ত করার তাগিদ অনুভব করেছেন। তৈল দানের একটি স্কুল বা কলেজ খোলার প্রস্তাবও করেছেন। বস্তুত এটা তৎকালীন সময়ে তৈল দেওয়ার ব্যাপকতারই বহিঃপ্রকাশ। তৈলবাজ মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যে তৈল দিতে পারিবে, "তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসর হইতে পারে। আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।"

উপসংহার : 'তৈল' প্রবন্ধে মননশীলতার পাশাপাশি সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। এটি একটি চেতনা জাগানিয়া প্রবন্ধ। বাঙালি পাঠক এটি পাঠ করে বাস্তবসম্মত জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট হবে। কেননা প্রাবন্ধিক বলেছেন, এক তেলে চাকাও ঘোরে, আরেক তেলে মনও ফেরে। এভাবে তির্যক ভাষায় বাঙালি চরিত্রের নির্মম সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। আর মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন মানুষেরই প্রতিচ্ছবি।

■ প্রশ্ন : গ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে যে নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'পাদটীকা' নামক অসাধারণ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত রম্যলেখক, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পে লেখক তাঁর সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমনের ফলে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ফলে তখন থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের জীবনে নেমে আসে নানা দুর্ভোগ।

'পাদটীকা' গল্পের বেদনাসিক্ত নির্মমতা/সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা

স্কুলের পণ্ডিত মশাই : গল্পকার যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। স্কুলে তিনি বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি ঘুমাতেন টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে।

পণ্ডিত মশাইয়ের ব্যবহার : লেখককে পণ্ডিত মশাই খুব স্নেহ করতেন। তাই সর্বদা তার প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতেন। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ছাড়া তিনি সম্বোধন করতেন না লেখককে। পণ্ডিত মশাইয়ের গায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং হাঁটু-জোকা ধুতি পরতেন। তার গায়ে যে দড়ি প্যাঁচানো থাকত, অজ্ঞরা তাকে চাদর বলে অভিহিত করতো। ক্লাসে এসে একটা অজুহাত নিয়ে বকতে শুরু করতেন। আর যেদিন অজুহাত খুঁজে পেতেন না, সেদিন কৃৎ-তদ্ধিত আলোচনা করে এ মূর্খদের বিদ্বান করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কথা বলতেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চলাফেরা : পণ্ডিত মশাই সব সময় খালি গায়ে স্কুলে আসতেন। সেবার লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি একটি ফুলহাতা গেঞ্জি পরেন এবং অনভ্যাসের কারণে নানা বিপত্তির শিকার হন। লাট সাহেব ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি বিগলিত হয়ে বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সালাম করেন।

শিক্ষক জীবনের নির্মমতা : তিনদিন ছুটির পর পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসেছেন। লেখককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লাট সাহেবের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল তার তিনটি ঠ্যাং আছে, যেটির জন্য মাসিক খরচ পঁচাত্তর টাকা। আর পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে। পণ্ডিত মশাইয়ের পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে, তিনি তাদের সাক্ষী রেখে আত্ম-অবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন। ক্লাসের সেই নিস্তব্ধতা হিরণ্ময় ছিল না, সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন-স্মৃতি ভুলবার নয়।

'পাদটীকা' গল্পে বর্ণিত সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা : ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। এদেশের অভিভাবকরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃত বাদ দিয়ে সন্তানদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করে। ইংরেজির প্রতি মানুষের ঝোঁকপ্রবণতার কারণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদরও কমতে থাকে।

অবহেলিত শিক্ষক জীবন : গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের জীবন, সে সময়ের শিক্ষক জীবনের চিরন্তন চিত্র। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও শিক্ষকসমাজ সবার নিকট অবহেলিত, উপেক্ষিত। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে অনেকেই সমাজের উঁচু স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি।

সমকালীন শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব : ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এদেশের মানুষ দেশীয় আদর্শে শিক্ষিত হোক তা চায়নি। তাই মাদরাসা এবং হিন্দুদের টোল উভয়ই ইংরেজদের দৃষ্টিতে অবহেলিত ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইংরেজরা এসব প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

সমকালীন শিক্ষায় অর্থনৈতিক প্রভাব : ইংরেজদের আগমনের পর এদেশের মানুষ বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংস্কৃত বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতে সন্তানদের উৎসাহিত করে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই তারা ইংরেজি শিখতে আকৃষ্ট হয়।

নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি ও নির্মম সত্য : সংস্কৃতের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল বক্ষ্যমাণ গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তার তীব্র অনীহা। টোল প্রথা উচ্ছেদের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশ পড়াতেন তিনি। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভের কারণে ক্লাসে যতটা পড়াতেন তার চেয়ে বকতেন বেশি, আর দুই পা টেবিলের ওপর রেখে ঘুমাতেন। জীবনের ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বেঁচেছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক পণ্ডিত মশাই। তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা, যা কিনা লাট সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের সমান। কুকুরের একটি পায়ের সাথে নিজেকে তুলনা করে তিনি আত্ম-অবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখেন। এভাবে গল্পকার 'পাদটীকা' গল্পে রসাত্মক বর্ণনাভঙ্গিতে যে নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তা পাঠককে হতচকিত করে।

উপসংহার : সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের দুর্দশার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। পণ্ডিত মশাই লেখককে খুব স্নেহ করতেন। তাই সব সময় কটু বাক্য বর্ষণ করতেন তাঁর প্রতি। লেখক রসাত্মক রচনার আড়ালে যে নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যি মর্মান্তিক, যা পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করে।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে কাজী নজরুলের 'শিউলিমালা' গল্পের সার্থকতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'শিউলিমালা' একটি বিরহকাতর প্রেমের গল্প। শিল্পমান বিচারে এটি একটি ছোটগল্প। কেননা বর্ণনাভঙ্গি, গল্পের আকার, সমাপ্তি সবকিছুর বিবেচনায় এটিকে ছোটগল্প হিসেবে অভিহিত করা যায়। এটি প্রেমরসে ভরা এক অনন্য ছোটগল্প। এটি পেয়েও না পাওয়ার আবহে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে।

ছোটগল্পের পরিচয় : ছোটগল্প কথা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটগল্প বলতে বোঝায় যা সাধারণত আধ ঘণ্টা থেকে এক বা দু'ঘণ্টার মধ্যে এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যায়। তবে আকারে ছোট হলেই তাকে ছোটগল্প বলা যাবে না। কারণ ছোটগল্পে বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকতে হবে, অল্পকথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে হবে। ক্ষুদ্র কলেবরে নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনাই এর সার্থকতা ও সফলতা। ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন–

'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা–
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ–
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গা করি মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।'

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য : ছোটগল্পে ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে বৃহত্তের ইঙ্গিত থাকে, এর আরম্ভ ও উপসংহার হয় নাটকীয়, এর বিষয়বস্তু সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে চলে। এতে মানবজীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত, ভাব বা চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, যে-কোনো ধরনের বাহুল্য বর্জনের মাধ্যমে গল্পটি হয়ে ওঠে রসঘন, এতে থাকে রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে অব্যক্ত কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত ইত্যাদি। সর্বোপরি গল্প সমাপ্তির পরেও পাঠকের মনের মধ্যে এর গুঞ্জরণ চলতে থাকে। এগুলোই একটি সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

'শিউলিমালা' গল্পের শিল্পমান : কাজী নজরুল ইসলামের 'শিউলিমালা' গল্পটিকে আমরা সার্থক ছোটগল্প হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কেননা ছোটগল্পের সকল বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বিদ্যমান। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

নাটকীয় সূত্রপাত : 'শিউলিমালা' গল্পটি একধরনের নাটকীয়তার মধ্য দিয়েই শুরু করা হয়েছে। হঠাৎ করে মিস্টার আজহার চরিত্রটি উপস্থাপন করে গল্পটিকে গতি দেওয়া হয়েছে, যা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ক্ষুদ্র আয়তনে বৃহৎ ভাব : 'শিউলিমালা' আয়তনের দিক থেকে মধ্যম আয়তনের ছোটগল্প। এ ছোট পরিসরে গল্পকার বৃহৎ একটি ভাবের অবতারণা করেছেন। শিউলি ও আজহারের অল্পদিনের জানাশোনায়, অল্পকিছু কথামালায় প্রেমের অনুরাগে এক গভীর রাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যা প্রেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করলেও ভাবের গভীরতায় তা অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে।

বর্ণনার ছটা আর ঘটনার ঘনঘটা থেকে মুক্ত : 'শিউলিমালা' গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে। স্থান-কাল ও ঘটনার ঐক্য এখানে স্পষ্ট, কিন্তু ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। এখানে আজহারের জীবনের অতি ক্ষুদ্র একটি অধ্যায় সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। মাত্র ত্রিশ দিনের কিছু ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই গল্পটিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। বাহুল্য বর্জিত বর্ণনার বিরহরসের মাধ্যমে গল্পটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

বিয়োগ-ব্যথা : বিদায়কালে শিউলির চোখ ভরা জল ছিল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো।' আর আজহার কী করবে জানতে চাইলে সে হেসে বলল, 'আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে।' গল্পের এসব বক্তব্য ছোটগল্পের সার্থক রূপায়ণই নির্দেশ করে।

রূপকের মধ্যে ব্যাপকতা : 'শিউলিমালা' রূপকের মাধ্যমে শিরোনাম করা হয়েছে। শিউলি চেয়েছে অন্য কোনো আশ্বিনে আজহার যদি তাকে মনে করে তবে যেন সে শিউলি ফুলের মালা গেঁথে জলে ভাসিয়ে দেয়। কেননা শিউলি ফুলের মতোই ক্ষণকালের জন্য তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ অংশেই গল্পটির মূল বিষয়টির ব্যাপকতা লুকিয়ে আছে, যা একটি ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শেষ হয়েও হয় না শেষ : 'শিউলিমালা' গল্পের শেষে প্রেম পরিণতি পায়নি। বিদায়বেলার দৃশ্যপটের অবতারণা স্পষ্ট করা হয়নি। একেবারে শেষ মুহূর্তে শিউলি বা আজহারের মানসিকতা কেমন ছিল তাও বর্ণনা করা হয়নি। শিউলি পরবর্তীতে কীভাবে সময় অতিবাহিত করেছে– তার প্রেমের শেষ পরিণতি কী ছিল তা লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে। অর্থাৎ গল্প শেষ হয়েছে বটে কিন্তু কাহিনি শেষ হয়নি, মাঝপথে থেমে গেছে, যা ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার : শিউলিমালা' একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। এতে বিরহ, প্রেম, না পাওয়ার বেদনা, বাহুল্য বর্জন ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এটিতে ছোটগল্পের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উপন্যাসের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার থাকে না, থাকে ভাবের ইঙ্গিত। তাই 'শিউলিমালা' একটি সার্থক ছোটগল্প এবং শিল্পমান বিচারে এটি যথার্থ হয়েছে।

■ প্রশ্ন : ঙ ॥ 'শিউলিমালা' গল্পের আলোকে শিউলির চরিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'শিউলিমালা' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি অনবদ্য প্রেমের গল্প। এ গল্পের নায়িকা-চরিত্র শিউলি। ধৈর্যশীলতা তার চরিত্রের অন্যতম দিক। তার চরিত্রে আরও যেসব গুণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো পিতৃভক্তি, প্রেমময়ী, দায়িত্বশীলতা, অধ্যবসায়ী, সংস্কৃতিমনা, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি। এভাবে গল্পের পরতে পরতে শিউলি চরিত্রের উপস্থিতি গল্পটিকে সুখপাঠ্য ও গতিশীল করেছে।

'শিউলিমালা' গল্পের শিউলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

পিতৃভক্তি : আত্মমর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্র শিউলি। বৃদ্ধ পিতা প্রফেসর চৌধুরীর অবসরের সাথি শিউলি। পিতার নিঃসঙ্গতায় তাকে সঙ্গ দেওয়া এবং তার সাথে দাবা খেলা শিউলির প্রতিদিনের কাজ। পিতার ভালো-মন্দের খোঁজখবর রাখে শিউলি। প্রফেসর চৌধুরী যখন মি. আজহারকে দাবা খেলার জন্য বলেন তখন শিউলি বলে উঠে, "কিছু মনে করবেন না। বাবা বড্ড দাবা খেলতে ভালোবাসেন। দাবা খেলতে না পেলেই ওর অসুখ হয়।" এসব কথায় শিউলির পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপন অনুরাগ : দীর্ঘদিন শিউলিদের বাড়িতে থাকার পর মি. আজহার যখন চলে আসার জন্য প্রস্তুতি নেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন তার প্রতি শিউলির গোপন অনুরাগ। আশ্বিন মাসের শেষ সন্ধ্যায় বিদায়ের পূর্বে আজহার শিউলিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এমনই আশ্বিন মাস– এমনি সন্ধ্যা আসবে– তখন কী করব, বলতে পারো?' শিউলি তখন তার দুচোখ ভরা কথা নিয়ে ধীরে ধীরে বলল– 'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো।'

মেধাবী : শিউলি একজন ভালো দাবাড়ু। মি. আজহারের সাথে দাবা খেলার সময় তার বাবা ভুল চাল দিলে সে শুধরে দেয় এবং প্রথমবারেই মি. আজহারের সাথে দাবা খেলতে গিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে। প্রফেসর চৌধুরী মি. আজহারের সাথে ড্র কিংবা হারের বৃত্তে ঘুরতে থাকলেও শেষবার শিউলি মি. আজহারকে হারিয়ে দেয়, যা তার সুতীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় বহন করে।

প্রেমময়ী : 'শিউলিমালা' গল্পে সবকিছুর উপরে মুখ্য হয়ে উঠেছে শিউলি ও আজহারের মানবীয় প্রেম। যদিও এ প্রেম এখানে দৃশ্যমান হয়নি, আনুষ্ঠানিকতা পায়নি, তবে গভীর আবহ সৃষ্টি করেছে। ভাবনার জগতে আলো ছড়িয়েছে– দুজনকেই ভাবুক বানিয়েছে। শিউলির প্রতিটি চাহনি, প্রতিটি পদক্ষেপ এখানে ভাষা পেয়েছে। শিউলির মনে প্রেমের যে দমকা হাওয়া বয়েছিল– সে জানত সেটা বইতে থাকবে; লক্ষ্যস্থলে গিয়ে থমকে দাঁড়াবে না কোনোদিন। এ জানা তাকে বিরহকাতর করেছে, অনেকাংশে তার জগৎটাকেই সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এ কারণেই সে বলেছে, "আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে।"

বুদ্ধিমতী ও সংস্কৃতিমনা : 'শিউলিমালা' গল্প জুড়েই শিউলির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। বাবা কিংবা মি. আজহারের সাথে দাবা খেলায়, গান শেখায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিদীপ্ত জবাবে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শিউলিকে সংস্কৃতিমনা মেয়ে বলা যায়। কারণ সে গান গাইতে ও শিখতে ভালোবাসে। গান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। যা দেখে মি. আজহার বলতে বাধ্য হয়েছে, "এর ভাষা যে শিউলিরই প্রাণের ভাষা–তারই বেদনা নিবেদন।"

সাজ-পোশাকে প্রেমের আভাস : বিদায়কালে শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল টকটকে লাল রঙের শাড়ি। মি. আজহার এভাবে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় আর কোনোদিন দেখেনি। মনে হলো সারা আকাশকে রঞ্জিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রঙের শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা-মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া। চোখ যেমন জুড়িয়ে গেল, তেমনি মনে পূরবীর বাঁশি বেজে উঠল।

অধ্যবসায়ী : প্রথম দিনের দাবার আসর শেষে গানের আসরে শিউলি মি. আজহারকে গান গাইতে অনুরোধ করে। মি. আজহার গান গাইলে সবাই বুঝে নেয় তার গানের গলা ভালো। প্রফেসর চৌধুরী গান শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রফেসর চৌধুরী এবং শিউলিকে গান শেখাতে লাগল মি. আজহার। শিউলি মনোযোগের সাথে গান শিখতে লাগল এবং মি. আজহারের প্রায় সব গানই কণ্ঠে মানিয়ে নিল। গল্পকথকের ভাষায়, "মনে হলো আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।" শিউলির অধ্যবসায়ের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

দায়িত্বশীল : মেয়ে শিউলিকে প্রফেসর চৌধুরী অবসর জীবনে যথার্থ সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন। বাবার ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিষয়গুলো সে তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল রাখে। সে জানে এ বয়সে বাবাকে ভালো রাখার অন্যতম উপায় তাকে সঙ্গ দেওয়া। সে সঙ্গ দেয়। তার ইচ্ছার মূল্যায়ন করে। প্রথম দিন মি. আজহারের সাথে দাবা খেলা শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে শিউলি মন্তব্য করেছে, "কিছু মনে করবেন না। বাবা বড্ড দাবা খেলতে ভালোবাসেন। দাবা খেলতে না পেলেই ওর অসুখ হয়।" এ উক্তির মধ্য দিয়ে তার দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধৈর্যশীল : শিউলি ধৈর্যশীল নারীর মূর্তপ্রতীক। কথায় আছে, 'নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না'– শিউলি চরিত্রটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজহারের প্রতি গভীর অনুরাগ তার নারীত্বকে নাড়া দিয়েছে। আশ্বিনের শিউলি ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে নিজের অগোচরে সুবাস ছড়িয়ে যেন ঝরে পড়েছে। তাই তার প্রাপ্তির খাতাটা শূন্যই রয়ে গেছে। ভীষণ ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে সে নিজেকে সংযত রেখেছে।

উপসংহার : 'শিউলিমালা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো শিউলি। এ গল্পে শিউলি-আজহারের প্রেম গভীর ভাবের সঞ্চার করেছে কিন্তু দৃশ্যপটে উপস্থিত হতে পারেনি। এদের উভয়ের প্রেম পরিণতি পায়নি। গল্পের শিউলি এমন একটি গ্রাম্য চরিত্র যাকে সাধারণের মধ্য দিয়ে অসাধারণ করে রূপদান করা হয়েছে।

■ প্রশ্ন : চ ॥ রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যে নিগূঢ় সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়, তা আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : প্রকৃতি জগতের সাথে মানবজীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রকৃতি তার আপন গতিতে চলে। চলার পথে সঙ্গী হয় ভাবুক বহুজন। এমন কেউ আছে যারা প্রকৃতির মাঝে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়। প্রকৃতির সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রাম্য প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা দুরন্ত, চঞ্চল মেয়ে 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী। এখানে রয়েছে শিক্ষিত যুবক অপূর্ব। গল্পের লেখক গ্রামের মেয়ে মৃন্ময়ীর প্রেমময়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক নিগূঢ় সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষিত নিগূঢ় সম্পর্ক

বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানবজীবনের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মেই মানব-শিশুর জন্ম হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল অতিবাহিত করে মানুষ জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছায়। জীবনের এ চলমান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মানুষের আচরণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। 'সমাপ্তি' গল্পে সে বিষয়টি সত্যিকার অর্থেই প্রত্যক্ষ করা যায় মৃন্ময়ী চরিত্রে। এসব বিষয় নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

মৃন্ময়ীর বিবাহপূর্ব জীবন ও প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠতা : 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী দুরন্ত একটি মেয়ে। ডরভয়হীন প্রাণোচ্ছল মনে আপন গতিতে চলত সে। তার প্রাণখোলা হাসি, শঙ্কাহীন পথ চলায় মুগ্ধ হতো অনেকেই, আবার তার দুরন্তপনায় বিরক্ত হতো কেউ কেউ। সমবয়সি মেয়েদের সাথে তার ভাব ছিল না, ভাব ছিল ছেলে বন্ধুদের সাথে। তার স্বভাব ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।" তার যা ইচ্ছা হতো আপন মনে করে যেত। পাত্রপক্ষ দেখতে আসা লজ্জাবতী বালিকার ঘোমটা আচানক সরিয়ে দেওয়া, পাত্রের নতুন জুতো চুরি করা, রাখালের পিঠে সজোরে চপেটাঘাত করা ইত্যাদি সবকিছুই তার প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে।

মৃন্ময়ীর বিবাহত্তোর প্রাথমিক জীবন : মৃন্ময়ী বিয়ের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ জীবনের পট পরিবর্তনে সে সম্পূর্ণভাবে এলোমেলো হয়ে গেল। নিজেকে সে বন্ধ খাঁচায় দেখতে পেল। শাশুড়ির শাসন তার মনটাকে বিষিয়ে তুলল। স্বামীর মধুমাখা বচনও তার কাছে তিক্ত মনে হলো। স্বামীর ঘর তার কাছে নরকের আগুনের মতো মনে হলো। সবার অজান্তে কখনো বটতলার রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথে আবার কখনো বাবার কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিয়ে করার অপরাধে অপূর্বর প্রতি সে ছিল বিরক্ত। চার দেয়ালে বন্দি মৃন্ময়ী রাগ-ক্ষোভ, জেদ আর কষ্টে অনবরত অশ্রু বিসর্জন দিতে লাগল। অপূর্বর কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। সবকিছু মিলিয়ে মৃন্ময়ী বিবাহত্তোর প্রাথমিক জীবনে মনঃকষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

মৃন্ময়ীর পরিবর্তন : মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তার প্রভাব পড়ে মৃন্ময়ীর পরিবর্তনের মধ্যে। কেননা অপূর্ব যখন কলকাতায় চলে যায় তখন মৃন্ময়ীর চরিত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। চঞ্চল মৃন্ময়ীর মন এবার স্থির হয়ে যায়। সকল চঞ্চলতা নিমিষেই ভদ্রতায় রূপান্তরিত হয়। যে স্বামীকে অবহেলায় পাশ কাটিয়ে গেছে সেই আবার স্বামীর বিরহে বিরহকাতর হয়ে ওঠে। শাশুড়ির অবাধ্যতা তার মনোজ্বালা হয়ে দাঁড়ালো। নিজের ভুলগুলো দিনের আলোর মতোই তার চোখে দেদীপ্যমান হলো। অনুতপ্ত মনে সে ফিরে গেল শাশুড়ির কাছে। তৃষ্ণার্ত পাখির মতো সে ক্রমান্বয়ে অতীত সময়ের দিকে ফিরে যেতে লাগল। নিজের অজান্তেই মনে হতে লাগল, "আহা অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।"

পরিবর্তনের কারণ : মৃন্ময়ীর চলার পথে বিশ্বপ্রকৃতিই পরিবর্তনের ছোঁয়া দিয়ে যায়। এ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন পরিক্রমা একই রকমের থাকে না। প্রতিটি ধাপে মানুষের আকার-আকৃতি, আচার-আচরণ, কথাবার্তায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। প্রকৃতির এ অমোঘ নিয়মেই মৃন্ময়ীর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তাই তো বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানবজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান।

অপূর্ব ও বিশ্বপ্রকৃতি : 'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক চরিত্র অপূর্বকৃষ্ণ। তার সাথেও বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কের দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন– গল্পকার বলেছেন, 'বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জল্ জল্ এবং বাতাসে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে।'

বিশ্বপ্রকৃতি ও 'সমাপ্তি' গল্পে মানবজীবন : 'সমাপ্তি' গল্পে দেখা যায়, মৃন্ময়ীর কৈশোরের চঞ্চলতা যৌবনে এসে পট পরিবর্তন করেছে। নারীত্বের প্রকৃত ধর্মের বোধোদয় ঘটার সাথে সাথে দুরন্ত মৃন্ময়ী অপূর্বের ন্যায় উদার মনের স্বামীসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির লীলা এখানেই প্রকটিত হয়েছে। কৈশোরে যা তার কাছে বিরক্তিকর ছিল যৌবনে তাই অনুরাগের হয়েছে। কৈশোরে যে জীবনকে সে বন্দিশালায় আবদ্ধ মনে করেছিল, যৌবনে পদার্পণ করে তাকেই পরমধর্ম মনে করে সাদরে গ্রহণ করেছে। এ পরিবর্তন বিশ্বপ্রকৃতির অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় হয়েছে।

উপসংহার : 'সমাপ্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অসাধারণ প্রেমের গল্প। এ গল্পের এক অনন্য চরিত্র মৃন্ময়ী, যার মাধ্যমে লেখক এক অতৃপ্ত প্রেম-কাহিনি রচনা করেন। মৃন্ময়ীর কৈশোরের চঞ্চলতা যৌবনে এসে পরিবর্তন হয় এবং স্বামীসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। এ পরিবর্তন বিশ্বপ্রকৃতির অদৃশ্য শক্তিতে হয়। লেখক এভাবেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের নিগূঢ় সম্পর্কটি বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

■ প্রশ্ন : ছ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পের আলোকে মৃন্ময়ী চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের গল্পাঙ্গনে এক অনন্য ছোটগল্প 'সমাপ্তি'। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অসাধারণ প্রেম ও প্রণয়ের গল্প। এ গল্পের প্রধান চরিত্র শিক্ষিত যুবক অপূর্ব। তার সাথে প্রেম হয় মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ী গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে। লেখক মৃন্ময়ী চরিত্রের মাধ্যমে একটি চঞ্চল মেয়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে গল্পটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পে আরও স্থান পেয়েছে মানবজীবনের সাথে বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কের বিষয়টি।

মৃন্ময়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ : 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী চরিত্র এবং প্রকৃতি সমান্তরাল হয়ে ফুটে উঠেছে। মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে মৃন্ময়ী এমনভাবে মিশে আছে যে, অপূর্বর প্রণয়ের দিকে তাকানোর সুযোগ সে পায়নি। নানা দিক থেকে তার চরিত্রটি বৈচিত্র্যময়। নিচে মৃন্ময়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো :

মৃন্ময়ীর দুরন্তপনা : 'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। গ্রামে বেড়াতে এসে তার এমন একজনের সাথে পরিচয় হয় যে কি-না গ্রামের মানুষের কাছে 'পাগলী' নামে পরিচিত এবং গ্রামের যত রাখাল তার খেলার সাথি। সমবয়সি মেয়েদের প্রতি তার অবজ্ঞার শেষ নেই। লেখকের ভাষায়, 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।' অপূর্ব যেদিন বাড়িতে আসে সেদিন সে কাদায় পড়ে গেলে মৃন্ময়ী উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ভেঙে পড়ে এবং মেয়ে দেখতে গেলে সেখান থেকে অপূর্বর বার্নিশ করা নতুন জুতা জোড়াটি চুরি করে। মৃন্ময়ী যেন আবার মিশে যায় প্রকৃতির কোলে। অপূর্ব আবার নতুন রূপে মৃন্ময়ীকে আবিষ্কার করে প্রকৃতিরই সান্নিধ্যে। গল্পের ভাষায়– "পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ঐ অসংগত চটি জুতা জোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না। অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল।"

অপরিবর্তনীয় আচার-স্বভাব : অপূর্ব পছন্দ করে মৃন্ময়ীকে। পাড়ার সব মানুষ অপূর্বর এ পছন্দকে অপূর্ব পছন্দ বলে নামকরণ করে। তবে অপূর্বর মা এ বিয়েতে বেঁকে বসলেও পুত্রের একান্ত আগ্রহের কাছে তিনি হার মেনে ছেলেকে মৃন্ময়ীর সাথেই বিয়ে দেন। বিয়ের পরও মৃন্ময়ীর সামান্য পরিবর্তন হয় না। আবার লুকিয়ে রাখাল বালকদের সাথে খেলা করতে যায়। এ নিয়ে মৃন্ময়ীর শাশুড়ি তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু মৃন্ময়ী প্রকৃতির আশ্রয় ছাড়া আর কোথাও শান্তি খুঁজে পায় না। বিয়ের পরেও সে লুকিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। তাই গল্পকার বলেছেন, "অপরাহ্ণে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়ে বসিয়া ছিল।"

মৃন্ময়ীর আকুল প্রত্যাশা : মৃন্ময়ী তার বাবার কাছে যেতে চায়। তাই গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনমালীর নৌকায় ওঠে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় মৃন্ময়ী ধরা পড়ে যায়। তবে গল্পকার এখানে নিদ্রিতা মৃন্ময়ীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে মৃন্ময়ীকে প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন– "ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী– দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।"

একদিন স্বামী অপূর্ব গোপনে মৃন্ময়ীকে তার বাবা ঈশান মজুমদারের কাছে কুশীগঞ্জে নিয়ে যায়। এই যাত্রাপথেই মৃন্ময়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের আভাস গল্পকার পাঠককে দিয়েছেন। যেমন– গল্পকার বলেছেন– "মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।... মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভয়ের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্‌বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।"

মৃন্ময়ীর মানসিক পরিবর্তন : মৃন্ময়ী কুশীগঞ্জে তিনদিন থাকার পর আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসে। অপূর্বর মা তাদের উপর রাগান্বিত হয় এবং এ সময় অপূর্বর কলেজ খোলার কারণে মৃন্ময়ীকে তার মায়ের কাছে রেখে কলকাতায় গমন করে। কিন্তু এখান থেকেই মৃন্ময়ীর মানসিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। মাতৃগৃহে তার আর মন টেকে না। সারাক্ষণ তার একটি স্মৃতি ভর করে থাকে এবং আর একটা শয্যার কাছে গুনগুন করে বেড়াতে থাকে। তারপর থেকে তাকে আর কেউ বাইরে দেখতে পায় না– হাস্যধ্বনিও শুনতে পায় না। অপূর্ব বিচ্ছেদবেদনা তাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করেছে। এক দুরন্ত বালিকার স্নিগ্ধ রমণী মূর্তিতে পরিণত হওয়ার চিত্র পাঠককে মুগ্ধ করে। সে তার স্বামীকে প্রচন্ড পরিমাণে অনুভব করে এবং আবার শ্বশুরালয়ে গমন করে। গল্পের ভাষায়– "শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক। শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।"

বন্ধুবৎসল মানসিকতা : মৃন্ময়ী সমবয়সি মেয়ে বন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রদর্শন করলেও ছেলে বন্ধুদের ক্ষেত্রে ছিল বন্ধুবৎসল। এ কারণেই রাখালের পিঠে সজোরে চপেটাঘাত করলেও রাখাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। গভীর বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই পরস্পরের এরূপ হাত চালানো ছিল তাদের নিত্যদিনের ঘটনা। বিয়ের পরে অপূর্বর ঘরে মৃন্ময়ীর বন্ধুবৎসল্যের পরিচয় মেলে। অপূর্ব পড়ালেখার জন্য কলকাতায় যাওয়ার প্রাক্কালে মৃন্ময়ী তাকে আদেশের স্বরেই বলেছে, "তুমি ফিরে আসার সময় রাখালের জন্য একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

প্রেম-চেতনা : স্বামীর প্রেমকে উপলব্ধির জন্য যে আঘাতের প্রয়োজন ছিল– বিচ্ছেদের দরকার ছিল তা মৃন্ময়ী পেয়েছে। অপূর্বর সাথে কলকাতায় না যাওয়ার কারণে সে নিজেকে দোষারোপ করে এবং মনে মনে বলে "তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন। আমার অনুরোধ মানিলে কেন।" অপূর্বর চাওয়া অপরিসমাপ্ত চুম্বনের জন্য সে নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে। অপূর্বকে বাড়ি ফিরে আসার জন্য চিঠি লেখে।

মৃন্ময়ী সাহসী : লাস্যময়ী মৃন্ময়ী ছিল অনেক সাহসী। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মৃন্ময়ীর কাছে ভয় আর সাহসের কোনো সংজ্ঞাই ছিল না। যা ইচ্ছা হতো আপন মনে করে যেত। পাত্রপক্ষ দেখতে আসা লজ্জাবতী বালিকার ঘোমটা আচানক সরিয়ে দেওয়া, পাত্রের নতুন জুতো সরিয়ে ফেলা, রাতের অন্ধকারে শ্বশুরালয় থেকে বেরিয়ে এসে নৌকা খোঁজা, এসবকিছুর মূলে ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত সরলতা। এ সরলতাই তাকে এত বেশি সাহসী করে তুলেছিল।

পুত্রবধূ হিসেবে সাদরে গ্রহণ : অবশেষে অপূর্বর মা তার পুত্রবধূকে নিয়ে কলকাতায় গমন করে। কিন্তু সংবাদটি গোপন রাখা হয় অপূর্বর কাছে। অপূর্বও মৃন্ময়ীকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে। ঝড়-বৃষ্টির রাতেই সে তার বাসায় ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ব সে রাতে ভগ্নীপতির বাসায় থেকে যায়। এরপর যা ঘটে তা হলো, "খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্বণ শব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বন তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্য বাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুধারায় সমাপ্ত হইল।"

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অপূর্ব সৃষ্টি মৃন্ময়ী চরিত্র। তার আবহেই 'সমাপ্তি' গল্পটি আবর্তিত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দুরন্ত কিশোরীর রমণী হয়ে ওঠার চমৎকার গল্প এটি। দুরন্তপনা থেকে প্রেম-ভাবনা, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তার চরিত্রে বিদ্যমান। সর্বোপরি এ চরিত্রটির মাধ্যমেই 'সমাপ্তি' গল্পের সকল রূপ-রস প্রকাশিত হয়েছে।

■ প্রশ্ন : জ ॥ 'সমাপ্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ নিরীক্ষার অনবদ্য দলিল– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ।।উপস্থাপনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প 'সমাপ্তি'। অপূর্ব ও মৃন্ময়ী চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় গল্প বলেছেন। তাঁর বলার মাঝে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনা এবং সমাজের নানা ধরনের অসংগতি। এককথায়, গল্পটি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সমাজ নিরীক্ষার এক অনবদ্য দলিল।

সমাজ নিরীক্ষার অনবদ্য দলিল হিসেবে 'সমাপ্তি' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষিত সমাজব্যবস্থায় নানা অসংগতি ছিল। তখনকার নারীসমাজ যেমন ছিল অবহেলিত তেমনি ছিল অসহায় ও অবজ্ঞার পাত্র। বাল্যবিবাহ দেওয়া একটা সামাজিক রীতি ছিল, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সমাজে অধস্তনদের প্রতি অবিচার করা হতো, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কৃষিনির্ভর। 'সমাপ্তি' গল্পটি সেভাবেই নিরীক্ষা করা যায়। এ বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

অবহেলিত নারীসমাজ : পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা অবহেলার পাত্র হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের মতামতকে এড়িয়ে যাওয়াই ছিল পুরুষদের ধর্ম। 'সমাপ্তি' গল্পেও বিষয়টি লক্ষণীয়। এখানে বিবাহের ক্ষেত্রে মৃন্ময়ীর কোনো মতামত নেওয়া হয়নি, উপরন্তু বিবাহের আয়োজন দেখে মৃন্ময়ী বলেছে, 'আমি বিবাহ করিব না'। এমন কথার কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি।

অর্থনৈতিক অবস্থা : তৎকালীন সমাজের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। তবে কিছু মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত ছিল। 'সমাপ্তি' গল্পে ঘাটে মহাজনের নৌকা ভিড়ানোর কথা এসেছে, ভাড়ায় নৌকা চালানোর কথা এসেছে, এসেছে মৃন্ময়ীর বাবার কেরানিগিরি করার কথাও। অর্থাৎ তখন মানুষ কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিজেদের নিয়োজিত রাখত।

দুর্বল বা অধস্তনদের প্রতি অবিচার : যুগ যুগ ধরে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চলে আসছে। 'সমাপ্তি' গল্পেও এ জুলুমের চিত্র ফুটে উঠেছে। একজন সামান্য কেরানি একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে সাহেবের কাছে ছুটি প্রার্থনা করে। গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক এবং ন্যায্য প্রাপ্তি এ ছুটিকে তুচ্ছজ্ঞান করে সাহেব ছুটি নামঞ্জুর করে দেয়। এ অমানবিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে।

বাল্যবিবাহ : তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তখন বাল্যবিবাহ না দেওয়াটা দূষণীয় হিসেবে পরিগণিত ছিল। লেখকের মৃন্ময়ীর শারীরিক অবস্থা ও বয়সের বর্ণনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যেমন– "শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত।" অপূর্বর পাত্রী দেখতে যাওয়ার ঘটনাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পাত্রী কর্তৃক উত্তরে প্রতীয়মান হয়, সে ছিল একেবারেই প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রী। অর্থাৎ তৎকালীন বাল্যবিবাহকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হতো।

পাত্রপক্ষের প্রাধান্য : আবহমানকাল ধরেই নারী-পুরুষের বৈষম্য সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি। 'সমাপ্তি' গল্পে এ ব্যাধি লক্ষ করা যায়। মৃন্ময়ীর বাবা ঈশান ছুটি না পেয়ে পাত্রপক্ষকে পূজোর ছুটি পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করে। পাত্রের মা ভালো দিনের অজুহাত দেখিয়ে বিবাহ না পেছানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কন্যার বাবা নিরুপায় হয়ে নিজের অনুপস্থিতিতে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

শ্বশুরালয়ে নবাগত বধূর করুণ অবস্থা : 'সমাপ্তি' গল্পে দেখা যায়, মৃন্ময়ী বধূবেশে শ্বশুরালয়ে এসে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। শাশুড়ির কড়া শাসন আর মানসিক নিপীড়নে সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শাশুড়ি তার মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা না করে নিজের শতভাগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। মৃন্ময়ী তৎকালীন সমাজের নববধূদের প্রতিনিধি। সামাজিক গোঁড়ামির কারণেই তার মতো নববধূরা শ্বশুরালয়কে বন্দিশালা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

চিরায়ত নারী চরিত্র : মৃন্ময়ী চিরায়ত সমাজের একজন নারী। একজন নারীর যে নারীসুলভ আচরণ তা 'সমাপ্তি' গল্পের সমসাময়িক নারীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। নাবালিকা থেকে বালিকা হয়ে ওঠার পথে মৃন্ময়ীর চরিত্রে বহুরূপী আচরণ পরিলক্ষিত হয়। গল্পের শেষটায় এসে আমরা মৃন্ময়ীকে পরিপূর্ণ একজন নারী হিসেবেই দেখতে পাই। এ পর্যায়ে মৃন্ময়ীর চরিত্রে তৎকালীন সমাজের নারীদের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

শাশ্বত প্রেম : প্রেম শাশ্বত ও স্বর্গীয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধি প্রেম তার অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। 'সমাপ্তি' গল্পের সমসাময়িক কালেও সমাজে এ প্রেম বিদ্যমান ছিল। মৃন্ময়ীর মানসিক পরিবর্তন, অনুতপ্ত হওয়া, স্বামীর বিরহে কাতর হয়ে অধীর অপেক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে স্বামীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের নারীদের শাশ্বত প্রেমের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। অপূর্বও স্ত্রীর ওপর জোর না খাটিয়ে মন পাওয়ার জন্য মৃন্ময়ীর ইচ্ছানুযায়ী চলেছে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজকে যেভাবে দেখেছেন, যেভাবে চিনেছেন সেভাবেই তাকে কথার ফ্রেমে আবদ্ধ করেছেন। একটি সমাজের সামগ্রিক চিত্র দেখার জন্য তৎকালীন সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কারণ লেখকগণ সমাজ থেকেই তাঁদের লেখার রসদ সংগ্রহ করেন। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পাই, 'সমাপ্তি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ নিরীক্ষার অনবদ্য দলিল।

গ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৫ ও ৬ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

■ প্রশ্ন : ক ॥ 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মহত্ত্বের পরিচয় দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উমর ফারুক (রা) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁর খেলাফতের সময়সীমা ছিল দশ বছর। 'ফারুক' হযরত উমরের উপাধি। তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পেরেছেন বলে তাঁকে 'ফারুক' উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক। বীরত্ব, কোমলতা, সাম্য, নির্ভীকতা ইত্যাদি নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি ভাস্বর ছিলেন।

উমর ফারুক (রা)-এর চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয়

শ্রেষ্ঠ বীর : উমর (রা) ছিলেন কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নামাজের জন্য প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার রীতি ছিল না। কুরাইশদের ভয়ে মুসলমানরা উচ্চৈঃস্বরে আজান দিতে সাহস পেত না। কিন্তু হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

সত্যের উপাসক : একজন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে হযরত উমরের খ্যাতি চির অম্লান। 'ফারুক' হযরত উমরের উপাধি। যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাকেই ফারুক বলা হয়। হযরত উমর (রা) ছিলেন তেমনি একজন প্রধান সাহাবি যাকে সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক বলা যায়। তাই কবি বলেছেন–

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।

তাওহিদের ঝান্ডাবাহী হযরত উমর : হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পৌত্তলিক ছিলেন। কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ বীর, রাসুল (স) এবং ইসলামের ভয়ংকর দুশমন– উমর খুন-তৃষ্ণায় তৃষ্ণিত হয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটে এসেছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর শিরশ্ছেদের অভিপ্রায়ে। কিন্তু সেদিন রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে নয়, তাওহিদের অমীয় সুধায় অশান্ত হৃদয় শান্ত করে মহানবি (স)-এর পদতলে ক্ষুরধার তরবারি সমর্পণ করে উমর (রা) আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কাফিরদের ভয়ে ভীত হয়ে আর গোপনে তাওহিদের বাণী প্রচার নয়, উমর (রা)-এর হাত ধরে এভাবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে স্বমহিমায় ও প্রকাশ্যে।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন : অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ হযরত উমর (রা) ছিলেন একেবারেই সাধারণের কাতারে, সাদামাটা। তাঁর না ছিল রাজপ্রাসাদ; না ছিল ব্যক্তিগত প্রহরী। মসজিদে নববীর খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তিনি। ঘুমিয়েছেন খেজুর পাতার ছাওয়া আর পাথরের দেওয়াল ঘেরা সামান্য গৃহে। কবির ভাষায়–

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি।

সাম্যের ধারক-বাহক : হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্যের ধারক-বাহক। তিনি রাজা-প্রজাকে একচোখে দেখেছেন। ভৃত্য-মনিবের সম্পর্কে তৈরি করেছেন এক নতুন ইতিহাস। জেরুজালেমের পথ ধরে চলার সময় তপ্ত মরুর উত্তপ্ত বালিকণার মাঝে ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে উটের রশি ধরে হেঁটেছেন। এমন সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বলেই কবি বলেছেন–

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

ভয়-ডরহীন বিচক্ষণ শাসক : হযরত উমর (রা) এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব। এ কারণেই জেরুজালেমের গির্জায় তাঁকে সালাত আদায়ের অনুরোধ করা হলেও তিনি তা করেননি। তিনি

উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি যদি সেখানে সালাত আদায় করেন তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ এটাকে বরকতময় বিবেচনা করে গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করে নেবে। হযরত উমরের এ বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন–

তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোকসমাজ
ভাবিবে– খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি....।

হযরত উমর (রা) বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পদচ্যুত করেন। কারণ ক্রমেই জনগণের মনে ধারণা হচ্ছিল যে, মুসলমানদের জয়ের একমাত্র কারণ খালিদের বীরত্ব। এ মহাবীরের দুর্দান্ত রণকৌশল তাঁকে সামান্যতম শঙ্কিত করেনি। কবির ভাষায়–

সিপাহ্-সালারে, ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

মানবপ্রেমিক : খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন মানবপ্রেমিক। তিনি রাতের আঁধারে মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট অবলোকন করতেন। নিজ হাতে সমস্যার সমাধান করতেন। উনুন জ্বালিয়ে শূন্য হাড়িতে রান্নার অভিনয় করে সন্তানদের সান্ত্বনা দেওয়া মাকে দেখে খলিফা উমর অঝর ধারায় চোখের পানি ঝরিয়েছেন। ছুটে গেছেন বাইতুল মালের খাদ্য গুদামে। নিজের পিঠে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে গেছেন দুখিনী মায়ের তাঁবুতে। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে তুলে দিয়েছেন ক্ষুধার্ত সন্তানদের মুখে।

ন্যায়বিচারের প্রতীক : পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিচারকদের অন্যতম ছিলেন হযরত উমর (রা)। নিজ সন্তান আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে আশিটি বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়েছিলেন। জল্লাদের প্রহার মনঃপূত না হওয়ায় নিজ হাতে চাবুক তুলে নিয়েছেন। নিজ হাতে প্রিয় সন্তানের পিঠে চাবুকের পর চাবুক মেরেছেন। ছেলের কান্না, আর্তনাদ, ক্ষমাপ্রার্থনা কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। নিজের চাবুকের আঘাতে চোখের সামনে সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তাইতো বলা যায়, তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রতীক।

ব্যবহার ও বেশভূষায় সাধারণ রীতি অবলম্বন : হযরত উমর (রা) একজন সাধারণ প্রজার সমপরিমাণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। প্রজারা যা পরিধান করতেন তিনিও তাই পরিধান করতেন। প্রজারা যে মানের খাদ্যগ্রহণ করতেন তিনিও সেই মানের খাদ্যগ্রহণ করতেন। রাজকার্য চালানোর জন্য, বিদেশি মেহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত পোশাক তাঁর ছিল না। কখনো কখনো প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাবে রাজসভায় যেতে তাঁর দেরি হয়ে যেত। কবি বলেছেন–

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে।

উপসংহার : হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন মানবপ্রেমিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব। তিনি রাজা-প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর হাত ধরে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে স্বমহিমায়। তাঁর জীবন ছিল একেবারেই সাদামাটা। তাঁর না ছিল রাজপ্রাসাদ, না ছিল ব্যক্তিগত প্রহরী। বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা তাঁর চরিত্রের ভূষণ। এভাবে 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায়।

■ প্রশ্ন : খ ॥ 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর।। উপস্থাপনা : কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম আধুনিক কবি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধারায় অসাধারণ চিত্রকল্পের এক শিল্পসার্থক কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি'। কবিতাটি কবির 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ কবিতায় কবি বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধের আনন্দ-বেদনা, অসম ত্যাগ, অম্লান স্মৃতিগাথা এবং গৌরবময় বিজয় উপাখ্যান অনুপম উপমা ও রূপকের আশ্রয়ে চিত্রায়িত করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামগ্রিক বাংলার জনসাধারণের অকৃত্রিম আত্মত্যাগের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উন্মোচনই এ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য।

'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার মূলবক্তব্য/ভাবার্থ বা সারমর্ম

স্বাধীনতা একটি জাতির মুক্ত সত্তা। আলোচ্য কবিতায় কবি শামসুর রাহমান বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা কবির অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছে। এ স্বাধীনতাকে কবি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক উপাদান ও জীবনের বিচিত্র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন।

বাংলার স্বাধীনতা যেন অধিকার আদায়ের দাবিতে পতাকা শোভিত শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল। এ স্বাধীনতাকে কবি শহিদ মিনারের অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভায় দেখেছেন এবং একে অনুভব করেছেন রবি ঠাকুরের অমর কবিতা ও অবিনাশী গানে এবং সৃষ্টির আনন্দে প্রমত্ত ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তায়। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।

কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বিচিত্র উপমার মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন– স্বাধীনতা মানুষের জীবন ও অস্তিত্বের জন্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। পিতার কোমল জায়নামাজ, উদার জমিনের চা-খানায়, মাঠে-ময়দানের ঝড়ো সংলাপে এবং মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে কবি বাংলার স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালির আনন্দময় অবসরে।

কবির ভাষায়– স্বাধীনতা মানে– বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী সাংস্কৃতিক কর্মীর সতেজ ভাষণ; বন্ধুর হাতে তারার মতো জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার এবং বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রং।

'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার কবি বাংলাদেশের অনবদ্য প্রাকৃতিক জীবনের বিচিত্র চিত্রে এদেশের স্বাধীনতার শক্তি ও সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হলো শ্রাবণের ভরা মেঘনা, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার কাটা। অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক যেন এ স্বাধীনতা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

এ স্বাধীনতা বন্ধুর হাতে জ্বলে ওঠা রাঙা পোস্টার, হাওয়ায় ওড়ানো গৃহিণীর ঘন কালো উদ্দাম চুল, খোকার গায়ের রঙিন জামা, খুকির তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা
খুকির অমল তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।

কবির দৃষ্টিতে স্বাধীনতা কোনো খণ্ডিত স্বপ্ন বা কল্পনা নয়; ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, মিলন-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অনুভূতি-সংবলিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় চেতনা। স্বাধীনতা জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করে, মুক্তি দেয় সামগ্রিক সত্তাকে। এ স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য জাতীয় জীবনের জন্য। স্বাধীনতাকে কবি দেখেছেন বাগানের ধারের স্নিগ্ধতা ও সৌরভের মতো। এ স্বাধীনতাকে মনে হয়েছে কোকিলের গান। এ স্বাধীনতাকে কবি অবলোকন করেছেন বয়েসি বটের পাতার ঝিলিমিলি মন-মাতানো রূপে। শুধু তাই নয়, এ স্বাধীনতা কবির গভীরতম আবেগের, তীব্রতম ভালোবাসার কবিতার খাতা। সমস্ত বাধা-নিষেধ, প্রতিবন্ধকতা, শাসন ও পরমুখাপেক্ষিতা এবং রক্তচক্ষুর দুঃশাসন থেকে মুক্তির মহান বাণী। এ স্বাধীনতাকে কবি তাই তার যেমন ইচ্ছে লেখার কবিতার খাতা বলে বর্ণনা করে তাঁর আবেগের গভীরতাকে পাঠকের কাছে এক অন্তহীন মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসি বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

উপসংহার : আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সুদীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত। কবি 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন এবং জাতীয় সত্তায় স্বাধীনতাকে কখনো কোমল, কখনো কঠোর উপমা উৎপ্রেক্ষায় চিত্রিত করেছেন। এতে কবির অনন্য ও প্রখর কাব্যমেধার স্বাক্ষর মেলে।

■ প্রশ্ন : গ ॥ 'স্বাধীনতা তুমি' শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা বন্দনার অনন্য প্রয়াস– বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। কবির সমৃদ্ধ মেধা-মনন ও জাগ্রত কাব্যগ্রন্থের প্রতীক 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাদেশিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শের এক গভীর অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ কবিতাটিতে কবি স্বদেশের স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন।

স্বাধীনতার বন্দনায় কবি : কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি দেশ ও জাতির স্বাধীনতায় বিমুগ্ধ, দেশপ্রেমমূলক আবেগের বহুমাত্রিক প্রকাশের এক পরিপূর্ণ দলিল। অজস্র বাঙালির রক্তঝরা স্বাধীনতাকে কবি দেশীয় ঐতিহ্যে নানা উপকরণে সজ্জিত করেছেন, জাতির আত্মত্যাগের গৌরবময় অহংকার ও প্রকৃতি-নিচয়ের অনির্বচনীয় অভিব্যক্তিকে কবি উচ্চারিত করেছেন এভাবে–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–

স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

এমনিভাবে মনের অভিব্যক্তিকে বাঙময় করতে গিয়ে কবি কবিতাটির স্তবকে স্তবকে স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন। কবির চেতনায় স্বাধীনতা রবি ঠাকুরের কবিতা আর গানের মতোই অবিনাশী, বিদ্রোহী কবি নজরুলের মাথার চুলের বাবরি দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা ঐশ্বর্যময়ী। কবি নির্বাচিত বিচিত্র উপমার অলংকরণে স্বাধীনতার অমিয় মাধুরী প্রত্যক্ষ করেছেন শহিদ মিনারের উজ্জ্বল সভায়, খুকির তুলতুলে গালে রোদের খেলায়, কৃষকের হাসিতে আর মজুরের গ্রন্থিল পেশিতে, মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিকে, কালবৈশাখির ঝড়ো হাওয়ায় ও বৃদ্ধ পিতার জায়নামাজের উদার জমিনে, মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে, বোনের হাতের মেহেদির রঙে, গৃহিণীর কালো চুল ও কোকিলের কুহুতানে। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন,
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।

কবি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অভিনবত্বে, একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন কবিতার প্রতিটি চরণে। কবি স্বাধীনতাকে লক্ষ করেন বন্ধুর হাতে তারার মতো উজ্জ্বল রঙিন পোস্টারে, খোকার গায়ের রঙিন জামা, খুকির নরম গালে রৌদ্রের খেলা, বাগানের ঘর, বয়েসি বটের ঝিলিমিলি পাতা ও কবির ইচ্ছেমতো কাব্য লেখার খাতার সাথে স্বাধীনতা মিশে আছে। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসি বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

এ স্বাধীনতার স্পর্শে সুপ্ত শক্তি হয়ে ওঠে দুর্বার ও অপ্রতিহত। এভাবেই কবি স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রামী মানুষের শৌর্যবীর্যে এবং বাংলাদেশের অনবদ্য প্রাকৃতিক জীবনের বিচিত্র চিত্রে কবি এদেশের স্বাধীনতার শক্তি ও সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন। কৃষক, মজুর, যুবা, জনতার কর্মকাণ্ড, তাদের সহজ-সরল জীবন ও প্রকৃতির সামগ্রিক রূপই স্বাধীনতার মূর্তপ্রতীক। যে কারণে কবি স্বাধীনতার বন্দনায় মুখর।

উপসংহার : কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের সন্তান। '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সংগ্রাম, স্বাধীনতা কবিকে দারুণভাবে আন্দোলিত-আলোড়িত করেছে। তাই কবি আকুলভাবে আমাদের রক্তঝরা স্বাধীনতার অকৃত্রিম বন্দনা করেছেন তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতা অবলম্বনে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক চিত্তাকর্ষক রূপময় চিত্র অঙ্কন করেছেন। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশ এক চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক। এদেশের রূপ-সৌন্দর্য কবির অনুভূতিতে বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত এবং সেগুলো তার অফুরন্ত ও অনাবিল আনন্দের উৎস। এখানকার নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-ঝরনা, সমুদ্র ইত্যাদির রূপময়তা তাঁকে আরও বেশি আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের রূপময় চিত্র : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি বাংলাদেশের এক অনুপম রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

নিরাপদ নীড় যেন এ রূপময় বাংলা : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতির যে অসাধারণ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন তা যেন শান্ত-স্নিগ্ধ, শ্যামল-সবুজ এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। লতায়-পাতায় ঘেরা বর্ণিল এক নিরাপদ নীড় যেন পূর্ব বাংলা। এদেশের পথে-প্রান্তরে বিরাজিত অজস্র গাছ-গাছালি ও লতাপাতার শ্যামলিমায় লুকিয়ে আছে বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি। কবির ভাষায়–

আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

প্রকৃতির স্নিগ্ধতা : কবি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমালের সাথে তুলনা করেছেন। এ উপমায় কবির একান্ত ও অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্ধকারের তমালগুচ্ছ যে অনুপম কোমল মাধুর্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করে, বাংলাদেশের নির্মল পরিবেশ ঠিক তেমনি যেন স্নিগ্ধতা বিলিয়ে দেয়।

বাংলার সন্ধ্যার রূপময়তা : দিন-রাতের আবর্তনে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি রূপ বদলায়। কবি বাংলাদেশের সামগ্রিক কোমলতাকে সন্ধ্যাকালের অপার স্নিগ্ধতার সাথে তুলনা করেছেন। দিনের কর্মকোলাহলের শেষে সন্ধ্যালগ্নে প্রকৃতিতে যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের বিস্তার হয় তা ভাষায় বহিঃপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত শব্দটিই পূর্ব বাংলা।

বৈচিত্র্যময় ষড়ঋতু : বাংলাদেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ষড়ঋতুর প্রভাবে এদেশে একেক ধরনের রূপ পরিলক্ষিত হয়। ঋতুর প্রভাবেই কখনো রাশি রাশি ধান জন্মে, আবার কখনো ফুলে ফলে ভরে যায় এদেশ। ঋতুবৈচিত্র্যে বাংলা নানা রঙে সজ্জিত হয়। তাই তো রূপময় আমার পূর্ব বাংলা।

বর্ষার রূপময় অনুরাগ : এদেশের বর্ষা-প্রকৃতি প্রেমিক-প্রেমিকার মনে আনন্দের শিহরন জাগায়। এর সাথে কবি মিল খুঁজে পেয়েছেন তাঁর দেখা প্রকৃতির সান্নিধ্যের অনুভবের। বর্ষার ঘন অন্ধকারের রাতে অনুরাগে ভরা দম্পতির মাঝে যে বাঁধনহারা সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয় বাংলাদেশের সৌন্দর্যকে কবি সেই সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করেছেন।

সিক্ত নীলাম্বরীর মতো অপরূপ প্রকৃতি : 'নীলাম্বরী' শব্দটি দ্বারা কবি নীল শাড়ি পরিহিতা রাধাকে বুঝিয়েছেন। 'বৈষ্ণব' কবিতায় বর্ষা রাতে রাধার বিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বর্ষাকে উপেক্ষা করে বিরহ বিহ্বলা রাধা নীল শাড়ি পরে রাতের অন্ধকারে মিলনের আশায় অভিসারে যেতেন। নায়িকার সিক্ত নীল শাড়ি নায়কের মনে যেরূপ গভীর অনুরাগের জন্ম দেয়, বাংলাদেশের নীলাভ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন যেন ঠিক তেমনি সৌন্দর্য ছড়িয়ে যায়।

বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্য : পূর্ব বাংলা এক চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক। এ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য সন্ধ্যার আবির্ভাবের মতো, অতল সরোবরের মতো, সুন্দরী রমণীর ঘনকৃষ্ণ কেশদামের তুল্য, কালো মেঘের ঘনীভূত রূপের মতো,– যেন তা বেদনা-বিধুর হৃদয়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়।

তরুণীর আকাশ দেখার অনুভূতি : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার অনুভূতিকে কবি 'কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ চিত্রকল্পটিতে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নবমেঘের সঞ্চারে উৎফুল্ল নারীর কেশ আলুলায়িত করে আকাশ অবলোকনের প্রসঙ্গ নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নবমেঘের ঘনঘটা তন্বী-হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার করে সেই আনন্দকে কবি এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনুভব করেছেন।

নারীর সৌন্দর্য : বাংলার সৌন্দর্যকে উপমিত করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে নারীর সৌন্দর্যের বিষয়টিও কল্পনা করেছেন। কবি বাংলাদেশকে মমতাময়ী নারীমূর্তিরূপে কল্পনা করতে গিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে কালো চুলের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

সৌন্দর্যের বহুমাত্রিকতা : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার বিষয়বস্তু কবির মাতৃভূমির সৌন্দর্য-প্রীতি ও নিসর্গ চেতনা। বাংলাদেশের রূপ-সৌন্দর্য কবির অনুভূতিতে বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত এবং সেগুলো তাঁর অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বন-বনানী, নানা রঙের ফুল, ফল, ফসলাদি, পাখির কলকাকলি ইত্যাদি এদেশের সৌন্দর্যের মূর্ত-প্রতীক। বাংলার রূপ-সৌন্দর্যকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি কবিতাটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

এক প্রগাঢ় নিকুঞ্জের প্রকৃতি : কবি পূর্ব বাংলাকে এক প্রগাঢ় নিকুঞ্জ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলার প্রতিটি গ্রাম সবুজের বেষ্টনীতে ঢাকা, ছায়াঘেরা, শান্ত-শ্যামল। পাতায় ছাওয়া, লতায় ঘেরা বাড়ি যেমন এক অনুপম আবাস, সবুজ বাংলাদেশও কবির কাছে তেমনি। বাংলার এই রূপময়তা সম্পর্কে কবি বলেছেন,

তুমি আমার পূর্ব বাংলা
পুলকিত সচ্ছলতায়, প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

উপসংহার : বাংলাদেশ কবির কাছে এক অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস। এদেশের প্রাকৃতিক নানা অনুষঙ্গ কবিকে বিমোহিত করেছে। কবি আশ্চর্য হয়ে এদেশের রূপ-ঐশ্বর্য অবলোকন করেন ও আনন্দ অনুভব করেন। নানা উপমা দিয়ে কবি বাংলাদেশের রূপময়তার বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশের রূপ-সৌন্দর্য কবির অনুভূতিকে বহুমাত্রিকতা দিয়েছে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময়তার বর্ণনা দিয়েছেন।

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ "'বনলতা সেন' একটি অনন্য আধুনিক বাংলা কবিতা"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।।উপস্থাপনা : কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এটি প্রেমানুভূতির এক অনবদ্য কবিতা। এ কবিতায় কবি যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা যেন সকল পুরুষের অনুভূতিতে স্পর্শ করেছে। গভীর প্রেমানুভূতি, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, ইতিহাস চেতনা ইত্যাদির এক অপূর্ব মেলবন্ধন এ কবিতায় লক্ষণীয়। এটি একটি অসামান্য আধুনিক বাংলা কবিতার পর্যায়ভুক্ত। কেননা ভাষার কারুকার্যে, উপমার প্রয়োগে, শব্দের ব্যবহারে কবিতাটি অনবদ্য রূপ লাভ করেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতা হিসেবে 'বনলতা সেন'

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃত অর্থেই একজন অতি আধুনিক কবি এবং আধুনিক রীতির প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিবর্ণ-বিষণ্ণতা তাঁর কাব্যের মূল সুর ও মর্মকাহিনি। তিনি উল্লেখ করেছেন– "সকলেই কবি নয়– কেউ কেউ কবি; কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার

ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা আছে।" "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'বনলতা সেন'। কবি এ কবিতাটির ভাব সংগ্রহ করেছেন Adger alan Poe-এর To Helen কবিতা থেকে। 'বনলতা সেন' কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা না হলেও তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। কবির জীবনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইংরেজি, ফারসি, গুজরাটি, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় কবিতাটি অনূদিত হয়েছে।

আধুনিক কবিতা : কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক কবিতা। এ কবিতার ভাব, ভাষা, শব্দচয়ন, অলংকার, ছন্দ সবই আধুনিক। তবে আধুনিক কবিতার যে অন্যতম উপাদান দুর্বোধ্যতা ও অশ্লীলতা তা এ কবিতায় নেই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বিদ্যমান। একজন শান্তি প্রত্যাশী মানুষ সভ্যতার সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আধুনিক সভ্যজগতে পৌঁছে শান্তির অন্বেষণে বিভোর। পথে চলতে চলতে সে তার প্রত্যাশিত মানবীয় সন্ধান পেয়েছে নাটোর এসে। মানুষটির কল্পিত সে মানবীয় নাম বনলতা সেন। এ 'বনলতা সেন' সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক। প্রত্যেক পুরুষের সুখ ও স্বস্তির জন্য একজন করে বনলতা সেন আবশ্যক। কবির অন্বেষণী মনের এ ভাব ও চিন্তা আধুনিক। এ কবিতায় কবি অনন্য উপমা ব্যবহার করেছেন। অপলক চোখ বুঝাতে তিনি 'পাখির নীড়' এবং নিঃশব্দতাকে বুঝাতে 'শিশিরের শব্দ' ব্যবহার করেছেন। এমন সুন্দর উপমা আধুনিক কাব্য সাহিত্যে বিরল।

ভূগোল-ইতিহাসে প্রেম-সৌন্দর্য অনুসন্ধান : এ কবিতায় বহুদিন যাবৎ এক পরিব্রাজক পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কবির ভাষায়–

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।

কবির এ চরণগুলোতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরিব্যাপী পরিভ্রমণের কথা আছে। বর্তমান যুগে প্রেমের অপরিহার্য রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে।

ইতিহাসের পটে নারী সৌন্দর্য : প্রাচীন ভারতের বণিকেরা যে পথ ধরে দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করতে যেত– সে পথ বেয়েই পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কবি বলেছেন–

অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার আলোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরও দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে।

কবি ইতিহাসের পটে নারীকে উপস্থাপিত করে তার সৌন্দর্যকে অপরূপত্ব দিয়েছেন। যেমন–

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

এখানে 'শ্রাবস্তী', 'বিদিশা' কথাগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে কোনো এক মন্ত্রবলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক স্বপ্নময় ভূমি।

প্রেম ও শান্তির প্রতীক 'বনলতা সেন' : 'বনলতা সেন' কবিতার বনলতা সেন প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশেষ নারী বা ব্যক্তি নয়– সে হৃদয়বান এবং প্রেম ও শান্তির প্রতীক এক চিরন্তন মানবী। যে আবহমানকাল ধরে প্রেম ও শান্তির ধারাকে অব্যাহত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখবে। কবিতার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি– "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।" এতো কোনো ব্যক্তির প্রেম ও শান্তির অন্বেষার পদযাত্রা নয়; বরং চিরকালের মানবযাত্রারই অন্য নাম। এই মানবযাত্রার মধ্যেই নিহিত আছে শান্তি এবং সমৃদ্ধির বাণী। কবির ভাষায়–

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

'বনলতা' এখানে এক অর্থে নারী– আরেক অর্থে প্রকৃতি। জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তা প্রকৃতিতেই শান্তির সন্ধান করেছে। জীবনের আঘাত, বিক্ষোভ, অশান্তিতে তিনি আশ্রয় পেতে চেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে শান্ত হতে চেয়েছে তাঁর অশান্ত হৃদয়।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ : 'বনলতা সেন' কবিতার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইতিহাস-ঐতিহ্য। যে ইতিহাস আমাদের গৌরবের, আমাদের অহংকারের এবং সমৃদ্ধির। কবি তাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের সেই ইতিহাসকে। যেমন–

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।

প্রেম ও মৃত্যুর সম্পর্ক : এ কবিতায় একই সাথে অন্তর্লীন হয়ে আছে প্রেম-স্বপ্ন-আনন্দ-বেদনা-মৃত্যু-সমকাল এবং মহাকাল। প্রেম এবং মৃত্যুর অনিবার্য সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতাতে। বনলতার সাথে কবির মিলন তখনই হয়– যখন এ জীবনের আর চাওয়া-পাওয়া থাকে না। কবিতার ভাষায়–

সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী- ফুরায় এ– জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

শব্দ ও ক্রিয়ার প্রয়োগ : 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনটি বাক্যে তিনটি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া রয়েছে– হাঁটিতেছি, ঘুরেছি, ছিলাম। কবি তাঁর অনুবাদে 'ধূসর' এর প্রতিশব্দ হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিষ্প্রভ, কম আলোকিত, ঝাপসা, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল শব্দের। সম্ভবত তিনি পরিবেশ এবং ছন্দ সৃষ্টির প্রয়োজনে 'ধূসর' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। 'সফেন' শব্দটি কবির তৈরি বিশেষণ। মূল কবিতায় 'পথ' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে 'হাঁটা' কর্মের ক্রিয়া হিসেবে এবং আর একবার 'পৃথিবীর পথ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে হাঁটা ক্রিয়ার প্রসারক হিসেবে।

উপমার ব্যবহার : জীবনানন্দের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় উপমা প্রয়োগে। তাঁর উপমাগুলো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কোনো কবি প্রসিদ্ধির অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ থেকে রসঘন উপমা সৃষ্টিতে তাঁর তুলনা বিরল। যেমন–

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

এছাড়া এ কবিতায় কবি অনুপ্রাসের ব্যবহারেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। যেমন–

হাজার বছর ধরে/আমি পথ হাঁটিতেছি/পৃথিবীর পথে।

জীবনানন্দের এই অসাধারণ ছন্দ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "তাঁর কবিতায় কলা-কৌশলের অভাব নেই, ছন্দ তাঁর কোথাও টলেনি; মিল, অনুপ্রাস, পুনরুক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে।"

উপসংহার : 'বনলতা সেন' আধুনিক প্রেম-মননশীল অনবদ্য একটি কবিতা। এর যেমন রয়েছে ইতিহাস-চেতনা তেমনি রয়েছে রোমান্টিকতা। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এ চরণ সে কথাই বলে দেয়। এছাড়া শ্রাবস্তী, নাটোর, দারুচিনি দ্বীপ ইত্যাদি নামের উল্লেখে কবিতাটি বৈশ্বিক স্থান পেয়েছে। সব মিলিয়ে যথার্থই বলা যায়, 'বনলতা সেন' একটি অসামান্য আধুনিক বাংলা কবিতা।

■ প্রশ্ন : চ ॥ 'বলাকা' কাব্যের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম একটি কবিতা। এটি তাঁর গতিবাদের কবিতা। তিনি যেমন গতির উপাসক ছিলেন তেমনি নবপ্রবণ ও নবগতির জয়েরও ঘোষক। কবিমননের গতির সেই সুরধ্বনিই 'বলাকা' কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই কবি বলেছেন,

হে হংসবলাকা
আজ রাতে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
.....
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে–
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

'বলাকা' কবিতার ভাবার্থ/মূল বক্তব্য : 'বলাকা' কবিতায় বিশ্বকবি অনুভব করেন সৃষ্টির মূলে এক অফুরন্ত গতিবেগ। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের একটা স্রোত চলছে। বিশেষ কোনোকিছু স্থির হয়ে থাকে না। এ কবিতায় হংসবলাকার পাখার শব্দে নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুৎছটার মতো রেখা এঁকে যায়। বলাকার পাখার শব্দে বিস্ময়ের ঢেউ আকাশের উপর দিয়ে তরঙ্গিত হয়ে চলে যায়। হংসবলাকার পাখার ধ্বনিতে নদী, জল, স্থল, অরণ্য ও পর্বত– সবকিছুর নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। কবি মানসচক্ষে দেখতে পান পাখার গতির শব্দে নিশ্চল প্রকৃতির অন্তরে অন্তরে প্রবল গতির আবেগ। জগতের কোনোকিছুই যেন স্থিরভাবে নেই। সবকিছুই বন্ধন থেকে মুক্তির পানে ধাবমান। এ নিরবচ্ছিন্ন চলাতেই তার আনন্দ। আর এ চলার যেন কোনো বিরাম নেই, শেষ নেই। কেননা এ গতি প্রবাহের গতি, যেদিন রুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই জড়ত্ব ও পঙ্গুত্বে মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে। কাশ্মীরের ঝিলম নদীর আকাশে তখন সন্ধ্যা। ঝিলমের জল অন্ধকার। প্রকৃতি নিথর। তাই 'বলাকা' কবিতার কবি লিখেছেন–

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
.....
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একঝাঁক হংসবলাকা পাখা মেলে উড়ে গেল ঝিলম নদীর বুকে। মুহূর্তের মধ্যে কোন দূর থেকে দূরান্তরে উধাও হয়ে গেল। কবির লেখনী হতে বের হয়ে এলো–

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
.....
গিরিশ্রেণি তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

নীরবতা ভেঙে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল হংসের ডানা ঝাপটা। ঘুমন্ত আকাশ আচমকা আঘাত পেয়ে জেগে উঠল। স্তব্ধতার মৌনতা ভেঙে গেল। রোমাঞ্চিত মনে প্রশ্ন জাগল, এ কী হলো! কবিও তার জবাবে লিখলেন–

মনে হল, এ পাখার বাণী,
দিল আনি
শুধু পলকের তরে

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

.....

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে–
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।

হংসের এ পাখার বাণী যেন এক মুহূর্তে পুলকিত বেগের আবেগ জাগিয়ে দিল। চিত্তে জাগল চলার বাসনা। সুদূরে আকাশে হারিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর আকুল হলো। সেই উদাসী পাখার ব্যথিত বাণীতে পৃথিবীর প্রাণেও জাগল এক আকুলতা। সেই বাণী যেন মুখর হয়ে উঠল ব্যথা আর বেদনার সুরে।

হংসবলাকা তার গতি দিয়ে কবির অন্তরকে প্রশস্ত করে দেয়। গতিশীলতার নব চেতনায় সবকিছুই যেন ব্যাকুল হয়ে সন্ধ্যা-আকাশের উড়ে যাওয়া বলাকার মতো উড়ে যেতে চাইছে অজ্ঞাত পানে। মানুষের ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাও যেন উড়ে চলেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে জানা নেই, তবু আশা-আকাঙ্ক্ষার মোহে নিরুদ্দিষ্টভাবে ছুটে চলেছে। কোথায় সব চলেছে কে জানে। কবি বসে বসে নিখিলের সব পাখার ঝাপটার একই বাণীর সুর ধ্বনিত হতে শুনেছেন। যেন সবকিছুই সুর তুলেছে–

হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।

'বলাকা' কবিতায় গতির সুর বেজে উঠেছে। বলাকার বিরামহীন গতি এবং তার পাখার শব্দ কবির অন্তরে অদ্ভুত কল্পনা জাগিয়েছে। সে কল্পনা গতি বা যাত্রার কল্পনা। প্রকৃতির একটি উপযুক্ত পরিবেশে কবির গতি-অনুভূতি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে। এ অনুভূতি কবির একান্ত নিজস্ব। এ অনুভূতির গতির সঙ্গে কবি-মানসের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটা কবিতায় গতির জয়গান গেয়েছেন। বিশেষত 'বলাকা' কবিতাটিকে কবি প্রাণের গতির বাহন হিসেবে অভিহিত করেছেন। গতিবাদই হলো 'বলাকা' কবিতার মর্মকথা। প্রকৃতির এক উপযুক্ত পরিবেশে কবির গতি-অনুভূতি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে। কবির ভাষায়,

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

■ প্রশ্ন : ছ ॥ জসীমউদ্‌দীন রচিত 'মুসাফির' কবিতার মূলভাব লেখ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'মুসাফির' পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের একটি বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতাটি কবির 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির একরূপ প্রেমচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে; এ প্রেম যেন আধ্যাত্মিক-নির্ভর এক অনুভূতি। এ অনুভূতি যেমন নির্মম তেমনি একাকী নির্জনতায় পথচলাই তার মুখ্য। ছুটে চলার পথে মুসাফির সুখ-সন্ধানে বিভোর। এ কবিতার মাধ্যমে কবি একজন মানুষের জীবনচক্রের এক নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

'মুসাফির' কবিতার মূলবক্তব্য/মূলভাব : 'মুসাফির' কবিতায় কবির প্রেমচিন্তা ভাবের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে আমাদের দেশীয় ধর্ম-সাধনার ঐতিহ্যের যোগে এক চরম অনুভূত সত্যের মহিমা লাভ করেছে। ভালোবাসা এক দুর্লভ সম্পদ। এ ভালোবাসার গুণে পর আপন হয়, জগৎ সুন্দর হয়। কিন্তু সে ভালোবাসার অধিকারীকে জগতের শত লাঞ্ছনা, জ্বালা, বঞ্চনাকে সহ্য করে প্রেমের পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনা করতে হয়। মুসাফিরের নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য, অতিশয় যন্ত্রণাময়– নির্জন, নিষ্ঠুর, অন্ধকারময়; তার কারণ বহু তপস্যা করেও সে প্রেমময়কে এখনো পাওয়া যায়নি। তাই মুসাফির পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালোবাসার জন্য যে তপস্যা, সে দুঃখ বরণের তীব্রতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'মুসাফির' কবিতায়। প্রেমের দোসর থাকলেও মুসাফিরের দুঃখ-ব্যথার দোসর নেই।

মুসাফিরের নয়ন ভরা জল থাকলেও মোছার কেউ নেই। হৃদয় ভরা কথার কাকলি থাকলেও শোনার কেউ নেই। নির্জনতাই তার দোসর, ছন্নছাড়া বিরাগী সে। অস্তিত্বের দুঃসহ ব্যথা বহন করে শুধু প্রাণ-বন্ধুর দেখা পাওয়ার ভরসায় অনির্দেশের পথে হেঁটে চলছে। সে যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ। সাংসারিক স্নেহাকর্ষণ উপেক্ষা করে সে তার নিষ্ঠুর প্রাণ-বন্ধুর সন্ধানে ছুটে ফিরছে। চারদিকে নিদারুণ আঁধার-স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে, তার ক্রন্দন শোনার পরও মুসাফির ভ্রূক্ষেপহীন ছুটে চলেছে যন্ত্রণার অস্তিত্ব বহন করে। মুসাফিরের এরূপ পথ চলায় যে বাহ্যিক ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাতে এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন বাস্তবতার নির্মম চিত্র। আমাদের আয়ুষ্কাল মুসাফিরের মতো অবিরাম ছুটে চলেছে তার গন্তব্য পথে। এ পথচলা কেউ থামিয়ে দিতে পারে না; কোনো পিছু ডাকে ধমকে দাঁড়ায় না। দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঘৃণা-ভালোবাসা সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে অনন্তকাল ধরে পথিকের অবিরাম পথচলা। সময়ের পরিবর্তনে কিছু পথিকরূপী মুসাফির হারিয়ে যাচ্ছে আবার নতুন কিছু পথিকের আগমন ঘটছে। পথিকের পথ ফুরায় না, চলতে থাকে মুসাফির প্রাণ-বন্ধুর দেখা পাওয়ার আশায়।

উপসংহার : 'মুসাফির' পল্লিকবির একটি জনপ্রিয় ও জীবনমুখী কবিতা। এ কবিতায় একজন মুসাফিরের জীবনচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। মুসাফিরের অবিরাম পথচলার মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক ভাব এবং চিরন্তন বাস্তবতার নির্মম দিক তুলে ধরা হয়েছে 'মুসাফির' কবিতায়। কবির ভাষায়–

চলেছে পথিক– চলেছে পথিক– কতদূর– কতদূর,
আর কতদূরে গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।

ঘ বিভাগ

মান– ৫ × ৪ = ২০

প্রশ্নক্রম-৭ ও ৮ : যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ "ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষা অনুসরণ করে"– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর।। ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে : ব্যাকরণের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। ভাষার গতি-প্রকৃতি, তার স্বরূপ বা ধরন ব্যাকরণে রূপলাভ করে। ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাকরণ থেকে ধারণা লাভ করা যায়। ভাষায় দীর্ঘদিন ব্যবহারে যেসব রীতি প্রচলিত হয়েছে তার বিশ্লেষণই ব্যাকরণের বিষয়বস্তু। ভাষা সৃষ্টি হয়েছে আগে, ব্যাকরণ এসেছে ভাষার পথ ধরে। ভাষা ব্যবহারের ফলে যখন বিশেষ কিছু নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে তখন তা হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের বিষয়। ব্যাকরণের নিয়মকানুন ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। সেজন্য ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না, কেবল ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে। ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু ভাষা নিজের গতিতে চলে বলে কখনো কখনো ব্যাকরণের বিধিবিধান অতিক্রম করে যায়, আর তখন সে ব্যতিক্রমকে ব্যাকরণ স্বীকার করে নেয়। ভাষার এমন কিছু প্রয়োজন আছে যা ব্যাকরণগত দিক থেকে ভুল। কিন্তু ভাষার ব্যবহারে গ্রহণযোগ্যতার জন্য সে ভুলও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তাই ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মশৃঙ্খলার আলোচনাই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই বলে ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করে না; বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে।

■ প্রশ্ন : খ ॥ উপভাষা কাকে বলে? কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর।। উপভাষা : উপভাষাকে ইংরেজিতে বলে dialect. কোনো ভাষা-সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে কোনো বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকালে বিশেষ কোনো ভাষা ব্যবহার করলে সেই ভাষাকে উপভাষা বলা হয়। বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদের মধ্যে অন্যতম হলো উপভাষা বা আঞ্চলিক শব্দ। বাংলা ভাষার কথ্য আঞ্চলিক রূপকে 'আঞ্চলিক ভাষা' বা 'উপভাষা' বলা হয়। সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাংলা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ করা যায়। এক অঞ্চলের মুখের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোক অনেক সময় বুঝতে পারে না; ফলে 'উপভাষা' বাংলা ভাষার কথ্য রূপ হলেও 'চলিত ভাষার' মতো সর্বজনবোধ্য নয়। 'চলিত ভাষা' যেমন বঙ্গদেশের সব অঞ্চলের মানুষই বোঝে, 'উপভাষা' তেমন বুঝতে পারে না; কোনো অঞ্চলের 'উপভাষা' সেই অঞ্চলের লোকই ভালো বোঝে।

কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপভাষার বিবরণ : আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষাকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. রাঢ়ি, ২. বঙ্গালি, ৩. বরেন্দ্রী, ৪. কামরূপী ও ৫. ঝাড়খণ্ডী। নিচে এ পাঁচ প্রকার আঞ্চলিক বা উপভাষার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হলো :

১। **রাঢ়ি :** বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা রাঢ়ি। রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে রাঢ়ি ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–
   ক. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন– কর্মকারক = আমাদের বই দাও। করণকারক = তোমাদের দ্বারা এ কাজ হবে না।
   খ. মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই আছ্ ধাতুর সাথে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন– কর্ + ছি = করছি, কর্ + ছিল = করছিল।

২। **বঙ্গালি :** ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঙ্গালি ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে এ ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–
   ক. কর্তৃকারকে (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কর্তায়)– এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন– মায়ে ডাকে। ঝিয়ে খায়।
   খ. অধিকরণ কারকে বিভক্তি হলো 'ত'। যেমন– বাড়িত থাকুম।

৩। **বরেন্দ্রী :** মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলে বরেন্দ্রী ভাষার ব্যবহার হয়। বরেন্দ্রী ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন–
   ক. বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো কখনো 'ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন– ঘরত (=ঘরে)।
   খ. সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন– খেলাম।

৪। **কামরূপী :** জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এ ভাষার ব্যবহার হয়। এ ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–
   ক. অধিকরণের বিভক্তি হলো '-ত'। যেমন– পাছত, পাছৎ (পশ্চাতে)।
   খ. গৌণ কর্মের বিভক্তি হলো '-ক'। যেমন– বাপক্ (-বাপকে), হামাক (আমাকে)।

৫। **ঝাড়খণ্ডী :** মানভূম, সিংহভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে এ ভাষা ব্যবহৃত হয়। ঝাড়খণ্ডী ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

ক. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন– যাবেক নাই?

খ. অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হলো– 'নু, -লে, -রু। যেমন– 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

■ প্রশ্ন : গ ॥ নিচের সাধু রীতির শব্দগুলোর প্রমিত রীতিতে পরিবর্তন করে বাক্য গঠন কর।

মালঞ্চ, কাঞ্চন, শস্য, হরিৎ, রক্ত।

উত্তর ।। নিচে শব্দগুলোর প্রমিতরীতিতে পরিবর্তন করে বাক্য গঠন করা হলো :

সাধুরীতি	প্রমিতরীতি
মালঞ্চ	বাগান
শস্য	ফসল
রক্ত	রক্ত

সাধুরীতি	প্রমিতরীতি
কাঞ্চন	সোনা
হরিৎ	সবুজ

বাক্য গঠন :

বাগান : আলী হোসেনের ফুলের বাগানে নানা ধরনের ফুল ফোটে।

সোনা : বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি।

ফসল : এদেশের মাটি অনেক উর্বর, তাই এখানে অনেক ফসল উৎপন্ন হয়।

সবুজ : বাংলাদেশে ছোটো বড়ো অনেক সবুজ বন আছে।

রক্ত : পূর্বাকাশে রামধনু উঠেছে, এর রক্ত আভা দেখতে খুবই ভালো লাগে।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ (পরীক্ষায় যে-কোনো পাঁচটি লিখতে হবে) :

আকাংখা, উৎকৃস্ট, উপরোক্ত, কাহিনী, প্রতিদ্বন্ধি, শশুর, সৌজন্যতা।

উত্তর ।।

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
উৎকৃস্ট	উৎকৃষ্ট
উপরোক্ত	উপরিউক্ত
কাহিনী	কাহিনি

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
প্রতিদ্বন্ধি	প্রতিদ্বন্দ্বী
শশুর	শ্বশুর
সৌজন্যতা	সৌজন্য

■ প্রশ্ন : ঙ ॥ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (পরীক্ষায় যে-কোনো পাঁচটি লিখতে হবে) :

আমরা, আনাগোনা, উপকূল, ছাত্রাবাস, জীবনবীমা, তেমাথা, দ্বিগু, নয়-ছয়, বহুব্রীহি, শতাব্দী, সেতার, হাসাহাসি, সপরিবার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

উত্তর ।।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরা [কু. বি. '১৯; হা. বি. '২০]	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব সমাস
আনাগোনা [ফা.প. (সম্মান) '১৮; হা. বি. '১৯, '২০; আ. বি. '২০]	আনা ও গোনা	দ্বন্দ্ব সমাস
উপকূল [ফা.প. (সম্মান) '১৮; দা. বি.; হা. বি. '২০]	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
ছাত্রাবাস	ছাত্রের জন্য আবাস	চতুর্থী তৎপুরুষ
জীবনবীমা	জীবন রক্ষার্থে যে বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তেমাথা [ফা.প. (সম্মান) '১৮; হা. বি. '২০]	তে (তিন) মাথার সমাহার	দ্বিগু কর্মধারয়
দ্বিগু [হা. বি. '২০]	সংখ্যা নির্দেশ করে যা	বহুব্রীহি সমাস
নয়-ছয় [হা. বি. '২০]	নয় ও ছয়	দ্বন্দ্ব সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বহুব্রীহি [ফা.প. (সম্মান) '১৮; আ. বি.; দা. বি.; হা. বি. '২০]	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
শতাব্দী [ই.বি.'১৯; হা. বি. '১৯, '২০]	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু কর্মধারয়
সেতার	সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
সপরিবার	পরিবারসহ বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি সমাস
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক	তৎপুরুষ সমাস

■ প্রশ্ন : চ ॥ ভাব-সম্প্রসারণ কর :

(১) মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন,
বিলাস ধন নহে।

(২) "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"।

উত্তর ।। (১) মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন,
বিলাস ধন নহে।

মূলভাব : ধনসম্পত্তি বিলাসিতার জন্য নয়, নিজের ও অপরের মঙ্গালে ব্যয় করার মাঝেই এর প্রকৃত সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষের অর্জিত অর্থবিত্ত কিংবা অধীত শিক্ষা থেকে যে বস্তুগত ও মনোবৃত্তিক প্রতিষ্ঠা– তা দুইভাবে মানুষ কাজে লাগাতে পারে। জনকল্যাণ ও জনস্বার্থবিরোধী– এই দুই বিপরীতমুখী কাজে মানুষ তার প্রতিপত্তিকে সাধারণভাবে কাজে লাগায়। মানুষের সর্ববিধ সম্পদের, জ্ঞানের যে অংশটুকু মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে তা-ই সত্যিকারের প্রতিপত্তি, সত্যিকারের ধন। ধনসম্পদের সার্থকতা নির্ভর করে এর যথার্থ ব্যবহারের ওপর। কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। তারা শুধু তাদের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনেই অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয়িত অর্থ হয়ত বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, কিন্তু এর দ্বারা বিন্দুমাত্র মানবকল্যাণ সাধিত হয় না। এতে শুধু অর্থের অপচয় হয় এবং চরম ব্যক্তিস্বার্থ উন্মোচিত হয়। মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিবিশেষের ধনসম্পদের ওপর কেবল তার একারই অধিকার থাকে না, সমাজভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষেরই তাতে কিছু না কিছু অধিকার থাকে। যে ব্যক্তি সমাজ, মানুষ ও দরিদ্র প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করে শুধু নিজস্ব ভোগবিলাসে এ ধন ব্যয় করে, কোনোক্রমেই তার সে কাজকে সমর্থন করা যায় না। আল কুরআনেও উল্লেখ আছে, "অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" এ প্রসঙ্গে জগতের বিখ্যাত মনীষীদের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁরা অনেকেই বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন না– তাঁদের যা সামান্য ছিল তাঁরা তাও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন, কখনো নিজের ভোগবিলাসের জন্য ব্যয় করেননি। অন্তর্নিহিত মঙ্গাল সাধনই ছিল তাঁদের একমাত্র শক্তি। কাজেই মানবের কল্যাণে ব্যয়িত অর্থ-সম্পদই যথার্থ ধন। ধনীর বিলাসিতায় ব্যয়িত অর্থ প্রকৃত ধন বলে গণ্য নয়।

মন্তব্য : ঐশ্বর্য দ্বারাই মানুষের কল্যাণ ও হিতকর কাজ করা যায় বেশি। যে অর্থ মানুষের কল্যাণকর্মে ব্যয়িত হয় না, সে অর্থের কোনো সার্থকতা নেই। মানবকল্যাণে ব্যয়িত সম্পদই ধন।

উত্তর ।। (২) "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"।

মূলভাব : কোনোকিছু অর্জন করা যতটা সহজ তাকে রক্ষা করা ও উপভোগ করা তার চেয়ে বেশি কঠিন।

সম্প্রসারিত ভাব : স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এটি ছাড়া মানুষ নিজেকে সঠিকভাবে বিকশিত করতে পারে না। তবে স্বাধীনতা কথাটি যতই মধুর হোক না কেন, মুখে বললেই তা অর্জন করা যায় না। তার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করতে হয়। কোনো রকম ত্যাগ স্বীকার না করে কোনো জাতি কোনোদিন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করতে আরও বেশি ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। এতো ত্যাগ এতো কৃতিত্ব সাধনার পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তাকে রক্ষা করে তার স্থায়িত্ব বিধান করতে আরও বেশি কষ্ট করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় নিরলস পরিশ্রম ও পারস্পরিক ঐক্য। এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে নারী-পুরুষ সকল নাগরিককে অশেষ চেষ্টা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে মাঠে ময়দানে, কল কারখানায় অবিরাম কাজ করতে হয়। দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করে দেশের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে হয়। কৃষির উন্নতি বিধান করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা আসে। তখন আর্থিক ও আত্মিক দিক দিয়ে তারা উন্নত ও মননশীল হয়ে ওঠে। তাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আরও সুন্দর হয়। দেশেও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্ম হয়, তারা দেশের যে-কোনো সমস্যায় এগিয়ে আসে। তাই স্বাধীনতা অর্জন করা যত সহজ তা রক্ষা করা তার চেয়ে বেশি কঠিন।

মন্তব্য : আধিপত্যবাদী শক্তি অনেক সময় মানুষকে পরাধীন করে রাখতে চায়। তাই স্বাধীনতা রক্ষা করাটা অর্জনের চেয়ে কঠিন। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সকল নাগরিকের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য।

■ প্রশ্ন : ছ ॥ তোমার এলাকায় একটি মডেল মসজিদ স্থাপনের আবেদন জানিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর।।

২৯শে জুন, ২০২...
বরাবর
জেলা প্রশাসক,
পিরোজপুর।

বিষয় : মডেল মসজিদ স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন, বৃহত্তর বরিশালের অন্তর্গত পিরোজপুর জেলার অধীনে 'ক' বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল গ্রাম। কয়েক বছর পূর্বে এখানে একটি মাদরাসা স্থাপিত হওয়ায় গ্রামটি আশপাশের ৭/৮টি গ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখন দরকার যুগোপযোগী মডেল মসজিদ। সরকার বা সরকারিভাবেই মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আমাদের এলাকায় অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান আছে। তাই এখানে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রাণের দাবি, এই গ্রামে একটি মডেল মসজিদ স্থাপন করা হোক। উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রচলিত অনেক শিক্ষাই মডেল মসজিদ থেকে গ্রহণ করা যায়। কেননা এরূপ মসজিদের বিজ্ঞ ইমাম যেমন তাদের ইসলামি চেতনায় সমৃদ্ধ তেমনি তারা পর্যাপ্ত হাদিস-কোরআন দিয়ে তাফসির করে থাকেন। যার মাধ্যমে আমরা পরকালীন মুক্তির বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারি।

এসব কারণে আমরা এই এলাকার তরফ থেকে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে একটি মডেল মসজিদ স্থাপনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে
হাসিবুল হোসেন
পিরোজপুর, বরিশাল।

■ প্রশ্ন : জ ॥ তোমার মাদরাসায় 'আরবি ভাষা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

উত্তর।।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২...
বরাবর
অধ্যক্ষ,
'ক' কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

বিষয় : 'আরবি ভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন।

সূত্র : ক (১২-খ)

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে সম্প্রতি আমাদের 'ক' কামিল মাদরাসায় আরবি ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

আজ বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস। ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেসকোর উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়। এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো, 'মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবি ভাষার অবদান।' ১৯৭৩ সালে ১৮ ডিসেম্বর ষষ্ঠ ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। জাতিসংঘের অন্য দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মতো আরবি ভাষা দিবস উদযাপনের জন্য দিনটি নির্ধারিত হয়। প্রতিবছর ইউনেস্কোসহ আরব রাষ্ট্রও আরবি ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আরব বিশ্বের ২৫টি দেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে তা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআন, হাদিস ও মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের রচনার ভাষা হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়। কয়েক হাজার বছর পার হলেও আরবি ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

আমাদের 'ক' কামিল মাদরাসার কামিল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আবির আহসানের কালেমা তায়্যিবার ক্যালিগ্রাফি সুন্দর হয়েছে। এমন সুন্দর করে তিনি লিখবেন শিক্ষক মহোদয় পর্যন্ত ভাবতে পারেননি। এক প্রশ্নের জাবে আবির আহসান বলেন, আরবি ভাষা কুরআনের ভাষা। মুসলমানদের হৃদয়ের সম্মানিত ভাষা। প্রায় ২৪ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মুসলমানকেই অন্তত তার ইবাদত পরিশুদ্ধ করতে আরবি ভাষা শিখতে হয়। আর আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস হতে হলে জানতে হয় আরো ভালোভাবে। দক্ষতা অর্জন করতে হয় ব্যাকরণে, সাহিত্যে।

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো: হারিস রঙের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার করে আরবি বর্ণসমূহ অঙ্কন করেছে। তার অঙ্কিত বর্ণগুলো বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর হয়েছে। তার শ্রেণির আরও অনেকেই বর্ণগুলো এঁকেছে। কিন্তু তার মতো পরিচ্ছন্ন হয়নি। তার শ্রেণি শিক্ষক এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সেমেটিক ভাষাগোত্রের মাঝে অনন্য এক অবস্থান নিয়ে আছে আরবি ভাষা। শুধু সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীই নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার মাঝে আরবি ভাষার রয়েছে সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত আসন। তাই বলা যায় আরবি ভাষা কালজয়ী ভাষা। কালের প্রবাহ কখনো এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। এই ভাষা স্থিতিশীল ও গতিশীল। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই কোনো না কোনো সময় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু আরবি ভাষা আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত।

মাদরাসার সকল ছাত্রই আরবি চারুলিপি বেশ ভালো জানে। মো: শফি, আকমল, আতিক ওরা বেশ সুন্দর করে আরবি ভাষার সুরা, আয়াত ক্যালিগ্রাফি করতে পারে। মো: শফি তাই বলে, এই লেখার মাধ্যমেই হয়তো অনেকে এ বিষয়টি জানবে যে, আরবি ভাষারও দিবস আছে এবং অন্যান্য দিবস পালনের মতো এটিও হয়তো দিবস পালনে উদ্‌বুদ্ধ করার কোনো প্রয়াস। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাই, এই লেখা সে ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে প্রচার বা প্রসারের নিমিত্তে নয়; বরং এটি একটি তথ্য– যা আরব বিশ্বসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরবি ভাষাকে নিয়ে প্রচলিত, তা সবার গোচর করা। আর আমরা যেহেতু কুরআনের এই ভাষাকে ভালোবাসি– তাই এ বিষয়ে একটু নতুন করে ভাবা। অথবা বলা যায় আরবি শেখার ক্ষেত্রে 'তাজদীদুন নিয়্যাহ' বা নিয়তের নবায়ন করা।

আমাদের মাদরাসার অধ্যক্ষ মহোদয় বলেন, সঠিকভাবে ভাষা শিক্ষা দিতে হলে ভাষা ও বিষয়ের সুসমন্বয় থাকা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক) ও সরকারি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের এ বিষয়ে নজর দেয়া দরকার। আরবি ভাষা শিক্ষাদানে ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর ও সুনির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে বোর্ড কর্তৃক পুস্তক প্রণয়ন করা এবং প্রত্যেকেই নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ছাহেবে মানহাজ' না হয়ে আরবি ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ এমন ভাষাবিদ ও আদিবদের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ মানহাজ বা সিলেবাস প্রণয়ন করা। ভাষাগত চারটি দক্ষতা (বলা, লেখা, পড়া এবং শোনা) পূরণে বর্তমানে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের দিক বিবেচনা করে একটি সুসমন্বিত পাঠ-উপকরণ তৈরি করা বেফাক ও সরকারি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। সহজে শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষায় পারদর্শী করে তুলতে 'পরিকল্পিত আরবি ভাষা পরিবেশ' সৃষ্টি করা। আরবি ভাষা বিষয়ে পাঠদান হতে হবে আরবিতে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সার্বক্ষণিক আরবি ভাষা চর্চার সুযোগ পাবে। লেখালেখির সাথে অভ্যস্ত করতে দেয়ালিকা, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করা। আরবি ভাষা শিক্ষাদানে নাহু-ছরফের (শব্দ গঠন শৈলী ও বাক্য গঠন শৈলী) মতো কথোপকথন ও ভাষাচর্চার কোর্স বা দাওরার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাঙ্গনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে আরবি পরিভাষা ব্যবহার করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে কুরানের ভাষার খেদমতে কাজ করার তাওফিক দান করুন। সঠিক ও সুন্দরভাবে আরবি ভাষা শেখার তাওফিক দান করুন। এই ভাষার জন্য আমাদের সবধরনের প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

সবশেষে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মাদরাসার প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ মহোদয় পুরস্কার তুলে দেন প্রতিযোগীদের হাতে। কালেমা তায়্যিবা ক্যালিগ্রাফি করেছেন আবির আহসান এবং তার এ লেখাটি অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি প্রথম পুরস্কার পান। দ্বিতীয় পুরস্কার পান মো: শফি। সে অঙ্কন করেছে সুরা আর রহমানের একটি আয়াত। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অধ্যক্ষ মহোদয়। এভাবে আমাদের মাদরাসায় আয়োজিত আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়।

■ প্রশ্ন : ঝ ॥ "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উপসর্গ হলো অর্থহীন শব্দাংশ। এরা শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দগঠন করে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির আলোচনা

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি হয়। যেমন– কাজ একটি শব্দ। এর আগে 'অ' উপসর্গটি যুক্ত হলে হয় অ-কাজ, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। অপকর্ম (মন্দ কাজ)। এখানে কর্ম (কাজ) শব্দের পূর্বে 'অপ' যোগ করায় নেতিবাচক অর্থ হয়েছে। পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় পরিপূর্ণ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ। 'হার' শব্দের আগে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ), 'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ), 'উপ' যুক্ত করে 'উপহার' (পুরস্কার),'সম' যোগ করে 'সংহার' (হত্যা) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, নাম বা কৃদন্ত শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে থাকলে উপসর্গের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু কৃদন্ত বা নাম শব্দের সাথে যুক্ত হলেই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

ব্যতিক্রম : বাংলা ভাষায় 'অতি' ও 'প্রতি' এ দুটি উপসর্গের কখনো কখনো স্বাধীন প্রয়োগ হতে পারে। যেমন– মাথাপ্রতি পাঁচ টাকা খরচ। অতি বাড়া ভালো নয়।

উপসংহার : উপসর্গের অর্থবাচকতা না থাকলেও অবশ্যই অর্থদ্যোতকতা আছে।

■ প্রশ্ন : ঞ ॥ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তর।। বাংলা একাডেমি/আধুনিক বাংলা বানানরীতি : বাংলা বানানের জটিলতা দূর করার জন্য কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি/আধুনিক/প্রমিত বাংলা বানানের বিশেষ নিয়মগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, উর্ণা, উষা।

২. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্জ্জন, উর্দ্ধ্ব, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম হবে।

৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন– অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন– অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল।

৪. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন– ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন– দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

৫. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন– কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন ইত্যাদি।

■ প্রশ্ন : ট ॥ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের তিনটি করে নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর।। ণ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ-তে পরিণত হয়, তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম : নিচে ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম বা সূত্র উল্লেখ করা হলো :

১. সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরে ট-বর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কণ্টক, কুণ্ঠা, লুণ্ঠন, দণ্ড, ভণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ– এ কয়টি বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– ঋণ, ভাষণ, কৃপণ, কর্ণ, বর্ণ, তৃণ ইত্যাদি।

৩. প্র, পরা, পরি, নির–এ চারটি উপসর্গের পর এবং অন্তর শব্দের পরবর্তী নব, নশ, নহ, নদ, নী, অন, হন্– এ ৭টি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– প্রণাম, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম : নিচে ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম বা সূত্র উল্লেখ করা হলো :

১. অ, আ, ভিন্ন অপরাপর স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– ইষ্ট, উষ্ণ, উষা, ওষ্ঠ, রাষ্ট্র, ওষধি ইত্যাদি।

২. ঋ বা ঋ-কারের পর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়ে যায়। যেমন– ঋষি, কৃষি, বৃষ্টি, সৃষ্টি, বৃষ ইত্যাদি।

৩. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– প্রতি + স্থান = প্রতিষ্ঠান, অনু + স্থান = অনুষ্ঠান, অভি + সেক = অভিষেক, প্রতি + সেধক = প্রতিষেধক ইত্যাদি।

■ প্রশ্ন : ঠ ॥ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লেখ।

উত্তর।। উপস্থাপনা : জন্মের পরই মানবশিশু চিৎকার করে। সে চায় ভাব বিনিময় করতে, যোগাযোগ করতে। মানব মনে প্রতিনিয়ত ভাবের উদয় হয়। এসব ভাবের বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে যে শব্দ বা অর্থপূর্ণ ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ভাষা বলে।

ভাষার সংজ্ঞা

সাধারণ কথায়, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে ভাষা বলে। এ বিষয়ে নিচে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

১. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,** "মনুষ্য জাতি যেসব ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।"

২. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,** "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ জনসমাজের ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

সাধু রীতি ও চলিত রীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে উভয় ভাষা রীতির পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১. সংজ্ঞা	যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলে, তাকে সাধু ভাষা বলে।	বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহৃত বা মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বলে।
২. ব্যাকরণ অনুসরণ	সাধু ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী।	চলিত ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী নয়।
৩. শব্দের প্রয়োগ	সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।	চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।
৪. স্থিরতা	সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয়।	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৫. ব্যবহার	গদ্য, সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল লিখনে এ ভাষার ব্যবহার যথোপযুক্ত।	চলিত ভাষা বক্তৃতা, আলোচনা ও নাট্য সংলাপের জন্য উপযুক্ত।
৬. পদবিন্যাস	সাধু ভাষায় পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত।	চলিত ভাষায় পদবিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
৭. অনুসর্গ	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হইতে, থাকিয়া, চাইতে ইত্যাদি।	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি।
৮. প্রকৃতি	সাধু ভাষা কৃত্রিম।	চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত।
৯. সন্ধি, সমাসের ব্যবহার	সাধু ভাষায় সন্ধি ও সমাসের আধিক্য লক্ষণীয়।	চলিত ভাষায় সন্ধি, সমাস বর্জন করে সহজ করে লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
১০. কর্মবাচ্যের ব্যবহার	সাধু ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়।	চলিত ভাষায় সংস্কৃতানুসারী 'এ' কর্মবাচ্যের ব্যবহার একেবারেই অচল।
১১. স্বর সংগতি	সাধু ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার বর্জনীয়।	চলিত ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়।
১২. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ রূপে হয়ে থাকে।	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আধুনিক ও সংকুচিতরূপ ব্যবহৃত হয়।
১৩. আঞ্চলিক প্রভাব	এ ভাষায় কোনো আঞ্চলিক প্রভাব নেই।	এটা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
১৪. ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাধু ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই বললেই চলে।	চলিত ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য বেশি। যেমন– কনকন, ঝনঝন, ঠনঠন।
১৫. নব ও প্রাচীন	সাধু ভাষা বেশ প্রাচীন।	চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।
১৬. বোধগম্যতা	সাধু ভাষা সকলের বোধগম্য নয়।	চলিত ভাষা সকলের বোধগম্য।
১৭. সময়গত	সাধু ভাষা বলতে ও লিখতে সময় বেশি লাগে।	চলিত ভাষা বলতে ও লিখতে সময় কম লাগে।
১৮. উদাহরণ	এখনো সে ফিরিয়া আসে নাই। তোমাকে কাছে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।	এখনো সে ফিরে আসেনি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

উপসংহার : সাধু ও চলিত ভাষা নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারে বাংলা ভাষার দুটি বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। তাই একই সঙ্গে এ দুটি ভাষার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সচেতনতার সাথে এ দুটি রীতিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যবহার করা উচিত।

■ প্রশ্ন : ড ॥ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রভাষক পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর।।

২৫শে এপ্রিল, ২০২...

বরাবর

উপাচার্য/অধ্যক্ষ,

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : প্রভাষক পদে নিয়োগের নিমিত্ত আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২০শে এপ্রিল, ২০২... তারিখে 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনতিবিলম্বে একজন প্রভাষক নিয়োগ করা হবে। আমি উল্লিখিত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আমার জীবনবৃত্তান্তের একটি বিবরণী আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি–

১. নাম : মোহাম্মদ গোলাম জাকারিয়া

২. পিতার নাম : জালাল আহমদ

৩. মাতার নাম : নূর জাহান বেগম

৪. স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর আলামপুর, ডাকঘর : সিলোনীয়া বাজার, থানা : দাগনভূঁঞা, জেলা : ফেনী।

৫. বর্তমান ঠিকানা : রতন কুটির, (চাঁন মিয়া মসজিদ সংলগ্ন), পুরাতন পুলিশ কোয়ার্টার, ফেনী।

৬. জন্ম তারিখ : ৫ই জানুয়ারি ১৯৮৫।

৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি।

৮. বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত।

৯. ধর্ম : ইসলাম।

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	ফলাফল	বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
দাখিল	১৯৯৯	প্রথম	সাধারণ	মাদরাসা
আলিম	২০০১	দ্বিতীয়	সাধারণ	মাদরাসা
ফাযিল (অনার্স)	২০০৫ (অনুষ্ঠিত ২০০৭)	দ্বিতীয়	আরবি	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ	২০০৬ (অনুষ্ঠিত ২০০৯)	দ্বিতীয়	আরবি	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক নিবন্ধন	২০১১	পাস	প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা)	NTRCA

১১. অভিজ্ঞতা : ১/১২/২০২... খ্রি. থেকে 'ক' কলেজে, প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা) পদে কর্মরত আছি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, উপরিউক্ত তথ্যের নিরিখে ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমার মেধা ও দক্ষতা যাচাইপূর্বক উক্ত পদে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

মোহাম্মদ জাকারিয়া

সংযুক্তি :

১. সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্রের অনুলিপি।

২. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।

৩. অভিজ্ঞতার সনদপত্র।

৪. সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।